সূচিপত্র

Section A: Conceptual Issues

ক্র: নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির পরিচিতি	
০১	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	০২
০২	আন্তর্জাতিক রাজনীতি	০৩
০৩	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য	০৫
০৪	আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্ব	০৬
০৫	আন্তর্জাতিক ও বৈশ্বিক ধারণা	০৭
০৬	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি	০৭
০৭	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও মডেল	১০
	বিশ্বের কর্মকসমূহ	
০৮	কর্মকের ধারণা	১৮
০৯	রাষ্ট্র	২১
১০	আধুনিক রাষ্ট্র	২৩
১১	বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা	২৪
১২	রাষ্ট্রের শ্রেণিবিভাগ	২৬
১৩	রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য	৩৩
১৪	সার্বভৌমত্ব	৩৪
১৫	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩৬
১৬	বহুজাতিক সংস্থা	৪০
	ক্ষমতা ও নিরাপত্তা	
১৭	শক্তি বা ক্ষমতা	৪৪
১৮	জাতীয় শক্তি	৪৫
১৯	জাতীয় স্বার্থ	৪৬
২০	শক্তিসাম্য	৪৭
২১	নিরাপত্তা ও যৌথ নিরাপত্তা	৪৮
২২	ট্রান্স-আটলান্টিক সম্পর্ক	৫১
২৩	দাঁতাত	৫১
২৪	আন্তর্জাতিক অপরাধ	৫২
২৫	আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মানবিক হস্তক্ষেপ	৫৪
২৬	নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ	৫৫
২৭	কোয়াড	৫৯

ক্র: নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৮	আলোচিত বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম	৬০
২৯	ভূ-রাজনীতি	৬৪
৩০	ভূ-অর্থনীতি	৬৫
৩১	বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধ	৬৫
৩২	অভিবাসী, শরণার্থী, রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী ও জেনেভা কনভেনশন	৭০
৩৩	Ethnic Conflict ও Interstate Conflict	৭২
৩৪	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence)	৭৩
	প্রধান ধারণা ও মতবাদসমূহ	
৩৫	জাতীয়তাবাদ	৭৭
৩৬	আন্তর্জাতিকতাবাদ	৭৯
৩৭	সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া সাম্রাজ্যবাদ	৮০
৩৮	উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ	৮২
৩৯	আধিপত্যবাদ	৮৫
৪০	উত্তর আধুনিকতাবাদ	৮৬
৪১	বিশ্বায়ন	৮৭
৪২	অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন	৮৯
৪৩	গ্লোকাল	৯০
৪৪	নয়া বিশ্বব্যবস্থা	৯১
৪৫	লোকরঞ্জনবাদ	৯১
৪৬	শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদ	৯২
৪৭	নব্য নাৎসিবাদ	৯২
৪৮	ফ্যাসিবাদ	৯৩
৪৯	সন্ত্রাসবাদ	৯৩
৫০	ইসলামোফোবিয়া	৯৪
৫১	একপাক্ষিকতা, দ্বিপাক্ষিকতা ও বহুপাক্ষিকতা	৯৫
৫২	কর্তৃত্ববাদ	৯৬
৫৩	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ	৯৭
৫৪	Liberal Institutionalism ও Traditional Liberalism	৯৮
৫৫	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব	৯৯

সূচিপত্র

Section A : Conceptual Issues

ক্র: নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি	
৫৬	পররাষ্ট্রনীতি	১০৩
৫৭	কূটনীতি	১০৬
৫৮	কূটনীতিতে নেগোসিয়েশন, পজিশন ও ইন্টারেস্ট	১০৭
৫৯	বিভিন্ন প্রকার কূটনীতি	১০৮
৬০	কূটনীতিকের ধারণা, সংজ্ঞা, কাজ, সুবিধা ও অবসান	১১৮
৬১	বাণিজ্যিক দূত সংক্রান্ত আইন	১২১
৬২	বিভিন্ন কূটনৈতিক মতবাদ	১২১
৬৩	পররাষ্ট্রনীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ	১২৩
৬৪	চুক্তি, চুক্তির প্রকারভেদ, চুক্তির সাথে প্রটোকলের সম্পর্ক	১২৪
	আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক	
৬৫	অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	১২৮
৬৬	বিভিন্ন ধরনের কর	১৩৩
৬৭	নব্য অর্থনৈতিক ধারণা	১৩৫
৬৮	অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য	১৩৭
৬৯	আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক	১৩৮
৭০	মেধাস্বত্ব	১৪১
৭১	বৈদেশিক বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক মন্দা	১৪২
৭২	সাহায্য, ঋণ ও সরকারি অর্থব্যবস্থা	১৪৬
৭৩	আঞ্চলিকতাবাদ ও আঞ্চলিকীকরণ	১৫১
৭৪	আঞ্চলিক কানেক্টিভিটি	১৫২
৭৫	উত্তর-দক্ষিণ বৈষম্য	১৫৬
৭৬	বৈশ্বিক দারিদ্র্য	১৫৭
৭৭	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য	১৫৮

ক্র: নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	বৈশ্বিক পরিবেশ	
৭৮	পরিবেশ ও প্রতিবেশ	১৬২
৭৯	জলবায়ু, জলবায়ু শরণার্থী ও জলবায়ু কূটনীতি	১৬৩
৮০	পরিবেশগত ইস্যু	১৬৬
৮১	জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব রোধে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ	১৬৭
৮২	পরিবেশ বিষয়ক প্রটোকলসমূহ	১৭৪
৮৩	পরিবেশ বিষয়ক কনভেনশন	১৭৫
৮৪	পরিবেশবাদী সংগঠন	১৭৬
৮৫	পরিবেশ বিষয়ক তহবিল	১৭৬
৮৬	পরিবেশ বিষয়ক পদক	১৭৭
৮৭	কার্বন বাণিজ্য	১৭৭
	Section C: Problem-Solving	
৮৮	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বাংলাদেশ	১৮৪
৮৯	ক্লাইমেট জাস্টিস ও বাংলাদেশ	১৮৬
৯০	বাংলাদেশের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল	১৮৯
৯১	শ্রম অধিকার ও গণতন্ত্র: বাংলাদেশের বৈশ্বিক সম্ভাবনা	১৯২
৯২	মধ্যপ্রাচ্যে কর্মসংস্থান সংকট: বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়	১৯৪
৯৩	বাংলাদেশের LDC উত্তরণ: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়	১৯৬
৯৪	মিয়ানমার সংকট ও বাংলাদেশ	১৯৭
৯৫	আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের কৌশলগত অংশীদারত্ব বৃদ্ধি	১৯৯
৯৬	বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা	২০১
৯৭	সোশ্যাল মিডিয়া কূটনীতি	২০৩

অধ্যায় ০৭

বৈশ্বিক পরিবেশ (Global Environment)

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০১. জলবায়ু পরিবর্তন সংকট বৈশ্বিক অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থায় কী ধরনের পরিবর্তন আনছে বলে আপনি মনে করেন? [৪৭তম বিসিএস]

০২. ব্রাজিলের বেলেম-এ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত **COP-30** সম্মেলনের অর্জনসমূহের সার-সংক্ষেপ বর্ণনা ও মূল্যায়ন করুন। বিশ্ব বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলো জলবায়ু সমস্যা সমাধান বিষয়ক আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সংলাপকে কেন ও কীভাবে প্রভাবিত করে? [৪৭তম বিসিএস]

০৩. জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশে প্রধানত কী ধরনের প্রভাব/অভিঘাত **(Impacts)** পড়েছে? [৪৬তম বিসিএস]

০৪. আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আলোচনা করুন। [৪৫তম বিসিএস]

০৫. চরম আবহাওয়ার ভয়াবহতাগুলো কী কী? [৪১তম বিসিএস]

০৬. জলবায়ু শরণার্থী **(Climate refugee)** বলতে কী বোঝায়? [৪০তম বিসিএস]

০৭. বৈশ্বিক সম্পদের **(Global Commons)** ধারণাটি কী? [৩৮তম বিসিএস]

০৮. কপ **(COP-22)** এর মূল সিদ্ধান্তগুলো কী কী? [৩৭তম বিসিএস]

০৯. কিয়োটো চুক্তি কী? এ চুক্তিটি কী উদ্দেশ্যে, কোথায় স্বাক্ষরিত হয়েছিল? [৩৪তম বিসিএস]

১০. "বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।"- আলোচনা করুন। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা আলোচনা করুন। [৩৩তম বিসিএস]

১১. কিয়োটো প্রটোকল কোথায় গৃহীত হয়? এর মেয়াদ কখন শেষ হবে? [৩২ ও ২৯তম বিসিএস]

১২. গ্রিনপিস কী? [২৯তম বিসিএস]

১৩. জলবায়ু পরিবর্তনে দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে- এই মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন। [২৯তম বিসিএস]

১৪. 'গ্রিন হাউজ ইফেক্ট' **(Green House Effect)** বলতে কী বুঝায়? এর ফলে পরিবেশ ও কৃষিতে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে? [২৮তম বিসিএস]

১৫. বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যার স্বরূপ আলোচনা করুন। এগুলো মোকাবিলার জন্য কী কী আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে? [২৫তম বিসিএস]

১৬. **Agenda-21** কী? [২৫তম বিসিএস]

১৭. বিশ্বের পরিবেশ দূষণের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন। [২৩তম বিসিএস]

১৮. সিএফসি **(CFC)** বলতে কী বোঝায়? [২২তম বিসিএস]

১৯. ওজোন স্তর **(Ozone layer)** কী জন্য প্রয়োজন? [২২তম বিসিএস]

২০. বর্তমান বিশ্ব যেসব প্রধান পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন সেগুলো কী? আপনার মতে সবচেয়ে উদ্বেগজনক সমস্যা কোনটি? এ সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ লিখুন। [১১তম বিসিএস]

২১. টীকা লিখুন:

(ক) জলবায়ু পরিবর্তন **(Climate Change)**; [৩২তম বিসিএস]

(খ) কিয়োটো প্রটোকল; [৩১তম বিসিএস]

(গ) **The World Climate Conference-3**; [২৯তম বিসিএস]

(ঘ) গ্রিনহাউজ ইফেক্ট; [২২ ও ২০তম বিসিএস]

(ঙ) প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য সংক্রান্ত চুক্তি; [২১তম বিসিএস]

(চ) নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পরিবেশ শীর্ষ সম্মেলন। [১৮তম বিসিএস]

পরিবেশ ও প্রতিবেশ

পরিবেশ

সাধারণ ভাষায় আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই নিয়ে আমাদের পরিবেশ। অর্থাৎ পরিবেশ হলো মানবজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী জীব ও অজীব উপাদানের সমষ্টি।

- **জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এর মতে,** 'পরিবেশ বলতে পরস্পর ক্রিয়াশীল উপাদানগুলোর মাধ্যমে গড়ে ওঠা সেই প্রাকৃতিক ও জীবমণ্ডলীর প্রণালিকে বোঝায় যার মধ্যে মানুষ ও অন্যান্য সজীব উপাদানগুলো বেঁচে থেকে বসবাস করে।'
- **The Oxford Dictionary (1992) এর মতে,** 'পরিবেশ হলো উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের উপর প্রভাব বিস্তারকারী চারপাশের অবস্থাগুলোর সমষ্টি।'
- **Monkhome (1992) এর মতে,** 'The whole sum of the surrounding external conditions within which an organism, a community or an object exists.'

সাধারণ অর্থে আমাদের চারপাশে যে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট অবস্থা রয়েছে তাকে পরিবেশ বলে। এটি জীবমণ্ডলের পরিবেষ্টন এবং এতে প্রভাব বিস্তারকারী সজীব ও অজীব উপাদানের সামগ্রিক অবস্থাকে পরিবেশ বলে।

প্রতিবেশ

Ecology বা প্রতিবেশ হলো পরিবেশের সাথে প্রাণিজগতের আন্তঃসম্পর্ক।

- **প্রতিবেশ সম্পর্কে Social Work Dictionary তে বলা হয়েছে,** 'The study of relationship between environment and organism.'
- **Borrow বলেন,** 'Ecology is the study of structure and function of Nature.'

সুতরাং বলা যায় প্রতিবেশ হলো এমন একটি আন্তঃসম্পর্ক যার দ্বারা জীবজগৎ এবং পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য সূচিত হয়।

চরম আবহাওয়া

কোনো স্থানের আবহাওয়ার ঘটনাগুলো যখন স্বাভাবিক প্রকৃতি পরিবর্তন করে ব্যাপক মাত্রায় বিরূপ আকার ধারণ করে তখন তাকে চরম আবহাওয়া বলে। এসব বিরূপ ঘটনা একদিন বা দীর্ঘদিনব্যাপী ঘটতে পারে। চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলো সাধারণত অপ্রত্যাশিত, অস্বাভাবিক, মারাত্মক বা অমৌসুমি হয়ে থাকে। প্রধান প্রধান চরম আবহাওয়ার মধ্যে রয়েছে তাপপ্রবাহ, শৈত্যপ্রবাহ এবং ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ব্যয়, মানুষের জীবনহানি, খরা, বন্যা, ভূমিধস এবং বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তনে চরম আবহাওয়ার প্রভাব দেখা যায়। প্রমাণ রয়েছে যে, চরম আবহাওয়ার পেছনে জলবায়ু পরিবর্তন দায়ী। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক তাপমাত্রা বিশ্বজুড়ে চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলোকে তীব্রতর করবে, যার ফলে মানব জীবননাশ, ক্ষয়ক্ষতি ও অর্থনৈতিক ব্যয় এবং বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে।

চরম আবহাওয়ার ভয়াবহতা

চরম আবহাওয়ার ভয়াবহতাগুলো কেবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি মানবসভ্যতা, অর্থনীতি এবং বাস্তুসংস্থানের প্রতিটি স্তরে গভীর ক্ষত তৈরি করছে। নিচে আপনার উল্লেখ করা পয়েন্টগুলোর ভিত্তিতে চরম আবহাওয়ার ভয়াবহতাগুলো প্যারা আকারে আলোচনা করা হলো:

১. **প্রাণহানি ও জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়:** চরম আবহাওয়ার সবচেয়ে সরাসরি এবং করুণ প্রভাব হলো ব্যাপক প্রাণহানি। শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়, আকস্মিক বন্যা কিংবা তীব্র দাবদাহে প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। তবে মৃত্যুর বাইরেও জনস্বাস্থ্যের ওপর এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব রয়েছে। বন্যার পরবর্তী সময়ে বিশুদ্ধ পানির অভাবে কলেরা ও ডায়রিয়ার মতো পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। অন্যদিকে, দীর্ঘস্থায়ী তাপপ্রবাহ বা হিটওয়েভের কারণে বয়স্ক ও শিশুদের মধ্যে হিটস্ট্রোক, শ্বাসকষ্ট এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এছাড়া দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট মানসিক ট্রমা বা বিষণ্নতা জনস্বাস্থ্যের এক অদৃশ্য কিন্তু ভয়াবহ সংকট হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

২. **কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা ধ্বংস:** প্রকৃতির রুদ্ররূপ সরাসরি বিশ্বের খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেয়। দীর্ঘস্থায়ী খরা মাটির আর্দ্রতা কেড়ে নেয়, ফলে ফসল উৎপাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে। আবার অকাল বৃষ্টি বা আকস্মিক বন্যায় মাঠের পেকে যাওয়া ফসল মুহূর্তেই তলিয়ে যায়, যা কৃষকের সারা বছরের পরিশ্রম ধূলিসাৎ করে দেয়। লোনা পানির অনুপ্রবেশের ফলে উপকূলীয় কৃষি জমি চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এর ফলে কেবল খাদ্য ঘাটতিই দেখা দেয় না, বরং বাজারে পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, যা দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষের খাদ্য নিরাপত্তাকে চরম ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়।

৩. **অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি:** চরম আবহাওয়া একটি দেশের বছরের পর বছর ধরে গড়ে তোলা ভৌত অবকাঠামোকে নিমিষেই ধ্বংস করে দিতে পারে। শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় বা টর্নেডোর আঘাতে ঘরবাড়ি, স্কুল-কলেজ এবং হাসপাতাল বিধ্বস্ত হয়। বন্যার পানি রাস্তাঘাট, ব্রিজ এবং কালভার্ট ভাসিয়ে নিয়ে যায়, যার ফলে দুর্গত এলাকাগুলো মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এছাড়া বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় উদ্ধার কাজ এবং জরুরি সেবা প্রদান ব্যাহত হয়। এই অবকাঠামো পুনর্গঠন করতে সরকারকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়, তা উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতির চাকা ধীর করে দেয়।

৪. **বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি:** মানুষের পাশাপাশি বন্যপ্রাণী এবং প্রাকৃতিক পরিবেশও চরম আবহাওয়ার কারণে অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হয়। অতিরিক্ত তাপমাত্রা ও শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে সৃষ্ট দাবানল কয়েক লক্ষ একর বনভূমি পুড়ে ছারখার করে দেয়, যেখানে বিলিয়ন বিলিয়ন বন্যপ্রাণী প্রাণ হারায় এবং তাদের আবাসস্থল ধ্বংস হয়। সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় সামুদ্রিক প্রবাল প্রাচীর বা কোরাল রিফ মারা যাচ্ছে, যা সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট করছে। অনেক বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী এই চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

৫. **অর্থনৈতিক বিপর্যয়:** চরম আবহাওয়ার ফলে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে নাড়িয়ে দেয়। কৃষি উৎপাদন হ্রাস এবং শিল্পকারখানা বন্ধ থাকার ফলে জাতীয় আয় বা জিডিপি কমে যায়। সরবরাহ ব্যবস্থা বা সাপ্লাই চেইন ভেঙে পড়ায় কলকারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্থবিরতা দেখা দেয়। এছাড়া বিমা কোম্পানিগুলোর ওপর ক্ষতির দাবি বা ক্লেম পরিশোধের চাপ বেড়ে যাওয়ায় আর্থিক বাজার অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসন এবং জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো তৈরিতে যে বিশাল বাজেট প্রয়োজন হয়, তা অনেক দেশের বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়িয়ে দেয়।

বৈশ্বিক সম্পদ (Global Commons)

Global Commons বলতে সেইসব প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট সম্পদ ও ব্যবস্থাকে বোঝায় যা সমগ্র মানবতার কল্যাণে ব্যবহৃত হয়, এবং যার ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। **UNEP** এর মতে, 'Global commons are resource domains or as areas that lie outside the political reach of any one nation-state, and thus require collective governance.'। প্রধান বৈশ্বিক সম্পদের উদাহরণ হলো - ১. Law of the sea অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক জলসীমা (মহাসাগর), ২. আন্তর্জাতিক মেরু অঞ্চল (অ্যান্টার্কটিকা), ৩. আউটার স্পেস, ৪. বায়ুমণ্ডল ইত্যাদি।

Tragedy of Commons

Tragedy of Commons একটি অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ধারণা যা ব্যাখ্যা করে কীভাবে সবার জন্য উন্মুক্ত সম্পদ ব্যক্তিগত লাভের জন্য অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয় এবং তা সমষ্টিগত বিপর্যয় সৃষ্টি করে। **গ্যারেট হার্ডিন এর সংজ্ঞানুসারে-** The tragedy of the commons develops when individual users acting independently according to their self-interest, behave contrary to the common good by depleting a shared resource.

মূল ধারণা

- সবার জন্য উন্মুক্ত সম্পদ হতে প্রত্যেকে নিজের সর্বোচ্চ লাভ প্রাপ্তির চেষ্টা করে।
- কিন্তু কেউই দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ বা সীমিত ব্যবহার আগ্রহী থাকে না।
- ফলে সম্পদটির অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে দ্রুত ক্ষয় হবে এবং সবারই ক্ষতি হবে।

উদাহরণ: উন্মুক্ত নদীতে সবাই বেশি করে মাছ ধরলে মাছের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং শেষ পর্যন্ত কেউ মাছ পায় না।

জলবায়ু, জলবায়ু শরণার্থী ও জলবায়ু কূটনীতি

কোনো নির্দিষ্ট স্থানের দীর্ঘ সময়ের, সাধারণত ২০-৩০ বছরের আবহাওয়ার বিভিন্ন অবস্থার গড় হিসাবকে জলবায়ু বলে। সাধারণত বৃহৎ এলাকাজুড়ে জলবায়ু নির্ণীত হয়ে থাকে।

জলবায়ু পরিবর্তন

কোনো জায়গার গড় জলবায়ুর দীর্ঘমেয়াদি ও অর্থপূর্ণ পরিবর্তন যার ব্যাপ্তি কয়েক যুগ থেকে কয়েক লক্ষ বছর পর্যন্ত হতে পারে তাকে **জলবায়ু পরিবর্তন** (Climate Change) বলা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন বিভিন্ন নিয়ামকের উপর নির্ভরশীল। যেমন- জৈব প্রক্রিয়াসমূহ, পৃথিবী কর্তৃক গৃহীত সৌর বিকিরণের পরিবর্তন, ভূত্বক গঠনের পাততত্ত্ব (plate tectonics), আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ইত্যাদি। সহজ ভাষায় বায়ুমণ্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর অস্বাভাবিকতা বৃদ্ধি পেলে জলবায়ুর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় তাই জলবায়ু পরিবর্তন।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

পরিবেশের নানা উপাদানকে মানুষ তার প্রয়োজনে যথেচ্ছা ব্যবহার করার ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী সার্বিক পরিবেশের বিপর্যয়কেই অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ুর ক্রমাগত বদলে যাওয়াকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার উপর যেসব প্রভাব পড়ছে-

- উচ্চ তাপমাত্রা, ঝড়, বন্যা, খরা, বিশ্ব স্বাস্থ্য, পানি ও খাদ্য ঝুঁকি তৈরি করবে।
- IPCC তথ্যমতে ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ু শরণার্থী ৫ গুণ বৃদ্ধি পাবে।

- তাপমাত্রা যেভাবে বাড়ছে সেভাবে বাড়তে থাকলে সমুদ্র উপকূলের দেশ যেমন- মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান এক সময় পানিতে তলিয়ে যাবে। IPCC ধারণা করছে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বর্তমানের ন্যায় বাড়তে থাকলে ২০৫০ সালে বাংলাদেশের ৩০% এলাকা তলিয়ে যাবে।
- WHO এর মতে ২০৫০ সালে বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তুর শিকার হবে ১৩.৫ মিলিয়ন।
- ২০২৩ সালের জুলাই মাসকে বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণতম মাস হিসেবে দাবি করেছে বিজ্ঞানীরা। আর এ উষ্ণতার কারণে অ্যান্টার্কটিকার সব বরফ গলতে শুরু করেছে যার প্রভাব পড়ছে সমুদ্র তীরবর্তী দেশগুলোতে।
- নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও সমুদ্রের লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট দেখা দিচ্ছে।
- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ওজনস্তর প্রতিনিয়ত ক্ষয় হচ্ছে যার কারণে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি মানবদেহের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে।

বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয় দুই-এক দিন বা দুই-এক বছরে হয়নি। বছরের পর বছর মানুষ পরিবেশকে তার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে গিয়েই পরিবেশকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেছে। বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয়ের পেছনে সর্বাধিক দায়ী বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলো। এ সকল রাষ্ট্র তাদের শিল্প এবং প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে গিয়ে পরিবেশকে ধ্বংসের সম্মুখীন করেছে। যার বেশির ভাগ প্রভাব পড়েছে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর উপর। পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয়ের এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে আগামী শতাব্দীতে পৃথিবী মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে। তাই আগামী পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার জন্য পৃথিবীর সকল মানুষ ধনী-দরিদ্র, উত্তর-দক্ষিণ ভেদাভেদ ভুলে জননী তুল্য পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসা উচিত।

বৈশ্বিক অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের জন্য কেবল পরিবেশগত সংকট নয়, বরং এটি বৈশ্বিক অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে আমূল পরিবর্তন আনছে। সম্পদের প্রাপ্যতা থেকে শুরু করে বাজারের নীতি-সবকিছুই এখন নতুন করে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন বৈশ্বিক অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থায় যে ধরনের পরিবর্তন আনছে, তা নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. **কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তর:** জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে সরাসরি প্রভাব পড়ছে কৃষি খাতে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে ফসলের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। ধান, গম ও ভুট্টার মতো প্রধান খাদ্যশস্যের ফলন অনেক দেশে ৩০-৪০% পর্যন্ত কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অনেক দেশে লবণাক্ততা বাড়ায় উপকূলীয় কৃষকরা ধান চাষ ছেড়ে মাছ চাষ বা লবণ-সহিষ্ণু ফসলের দিকে ঝুঁকছে। উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় বিশ্ববাজারে খাদ্যের দাম বাড়ছে, যা মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করছে।

২. **শিল্প উৎপাদন ও 'কার্বন বর্ডার ট্যাক্স':** উৎপাদন ব্যবস্থায় এখন পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বাধ্যতামূলক হয়ে উঠছে। উন্নত দেশগুলো এখন পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে 'কার্বন ফুটপ্রিন্ট' যাচাই করছে। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) বা কার্বন বর্ডার ট্যাক্স। এর ফলে যেসব দেশ বেশি কার্বন নিঃসরণ করে পণ্য উৎপাদন করে, তাদের রপ্তানি খরচ বেড়ে যাচ্ছে। কয়লা বা খনিজ তেলের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক কারখানাগুলো ধীরে ধীরে তাদের মূল্য হারাচ্ছে, যা বড় বড় বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন অর্থনৈতিক ঝুঁকি তৈরি করছে।

৩. **জ্বালানি খাতের আমূল পরিবর্তন:** জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে এসে বিশ্ব এখন নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। দেশগুলো এখন তেল-গ্যাস আমদানির চেয়ে সৌর, বায়ু এবং গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদনের দিকে বেশি বিনিয়োগ করছে। এটি বিশ্ব বাণিজ্যের ভারসাম্য বদলে দিচ্ছে। যদিও নবায়নযোগ্য জ্বালানির দীর্ঘমেয়াদি খরচ কম, কিন্তু প্রাথমিক অবকাঠামো তৈরির জন্য বিপুল পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হচ্ছে, যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৪. **অবকাঠামো ও বিমা খাতের ঝুঁকি:** চরম আবহাওয়া (বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, দাবানল) অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি করছে, যা অর্থনীতির ওপর বাড়তি বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে বন্দরগুলো ঝুঁকির মুখে পড়ছে, যা বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। জলবায়ু ঝুঁকির কারণে বাড়িঘর ও কারখানার বিমা খরচ আকাশচুম্বী হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বিমা কোম্পানিগুলো ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে সেবা দেওয়াই বন্ধ করে দিচ্ছে।

৫. **কর্মসংস্থান ও শ্রম উৎপাদনশীলতা:** অত্যধিক গরম বা হিটওয়েভের কারণে খোলা জায়গায় কাজ করা শ্রমিকদের (যেমন নির্মাণ বা কৃষি শ্রমিক) কর্মক্ষমতা কমে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর মতে, এর ফলে বিশ্ব অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্ব অর্থনীতিকে একটি 'Managed Transition' বা নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একদিকে যেমন অনেক খাতের পতন ঘটছে, অন্যদিকে 'সবুজ অর্থনীতি' বা 'গ্রিন ইকোনমি'র মাধ্যমে নতুন নতুন ব্যাবসা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তবে এই পরিবর্তনের খরচ উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অনেক বেশি।

জলবায়ু শরণার্থী

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নিজ বাসস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু শরণার্থী বলা হয়। ২০০০ সালের পরবর্তী সময় থেকে বৈশ্বিক উষ্ণায়নসহ নানাবিধ জলবায়ু সমস্যা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে 'জলবায়ু শরণার্থী'র সংখ্যাও। এই জলবায়ু শরণার্থী প্রত্যয়টি প্রথম Lester Brown ১৯৭৬ সালে ব্যবহার করেন। Norman Myers এর মতে ২০৫০ সাল নাগাদ জলবায়ু শরণার্থী হবে ২৫০ মিলিয়ন।

কারণসমূহ

১. বছরজুড়ে গড় তাপমাত্রার ব্যাপক পরিবর্তন।
২. উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা, ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে নিরাপদ পানির সংকট।
৩. জমিগুলোর উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ার দরুন তীব্র খাদ্য সংকট।
৪. অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা ইত্যাদি।
৫. বন উজাড়।
৬. অতিরিক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ।

বাংলাদেশে প্রভাব

নিউইয়র্ক টাইমসের করা অনুসন্ধানী এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ক্রমবর্ধমান এই লবণাক্ততা বাংলাদেশের ১৫ লাখ উপকূলীয় মানুষকে তাদের বাসস্থান থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছে, যাদের বেশিরভাগই রাজধানী ঢাকায় পাড়ি জমিয়েছে। পৃথিবীজুড়ে 'জলবায়ু শরণার্থী'র বেশিরভাগই হতে যাচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার কারণে।

জলবায়ু নিরাপত্তা

জলবায়ু নিরাপত্তা, নিরাপত্তা ধারণার অপ্রথাগত অংশের অন্তর্ভুক্ত। যা মানব নিরাপত্তারও অংশ। জলবায়ু নিরাপত্তা বলতে জলবায়ু পরিবর্তনগত ঘটনা এবং হুমকি থেকে নিরাপত্তাকে বোঝায়। এটি ব্যাখ্যা করে কীভাবে জলবায়ু নিরাপত্তা আন্তঃসীমান্ত সমস্যার সৃষ্টি করে। এছাড়াও এটি আলোচনা করে কীভাবে মানুষ, সম্প্রদায় এবং জাতি জলবায়ু হুমকি, জলবায়ু পরিবর্তন, সীমিত সম্পদ নিয়ে তা মোকাবিলা করে। জলবায়ু পরিবর্তনকে জলবায়ু নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মনুষ্য কার্যাবলি কার্বন নিঃসরণ ঘটায়। যা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিবেশের পরিবর্তন করে। ফলশ্রুতিতে কৃষি উৎপাদন কমে যায়। যা খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত, রাজনৈতিক অস্থিরতা, জাতিগত দ্বন্দ্ব, সামাজিক অস্থিরতা বাড়ায়। সুতরাং বলা যায়, জলবায়ু নিরাপত্তা নিশ্চিত করে খাদ্য নিরাপত্তা, পানির স্বল্পতা, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক অস্থিরতা মোকাবিলা করা যায় যা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তন কেবল একটি পরিবেশগত সমস্যা নয়, এটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান হুমকি হিসেবে স্বীকৃত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি 'Threat Multiplier' বা 'বিপদের গুণক' হিসেবে অভিহিত করেন। এর অর্থ হলো, এটি সরাসরি কোনো যুদ্ধ শুরু না করলেও বিদ্যমান সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে সংঘাতের পথ তৈরি করে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান প্রভাবগুলো নিচে প্রবন্ধ আকারে আলোচনা করা হলো:

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা সংকট

ঐতিহ্যগতভাবে 'নিরাপত্তা' বলতে কোনো দেশের সীমানা রক্ষা বা সামরিক শক্তিকে বোঝানো হতো। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নিরাপত্তার ধারণা এখন 'মানবিক নিরাপত্তা' ও 'ভূ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা'র দিকে মোড় নিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাকে মূলত পাঁচটি উপায়ে বিঘ্নিত করছে:

১. **সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা ও অভ্যন্তরীণ সংঘাত:** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে পানি এবং আবাদি জমির সংকট তীব্র হচ্ছে। যখন একাধিক দেশ একটি সাধারণ নদীর পানির ওপর নির্ভর করে (যেমন- নীল নদ বা সিন্ধু নদ), তখন পানির অভাব দেশগুলোর মধ্যে উত্তেজনা ও যুদ্ধের ঝুঁকি বাড়ায়। খরা বা মরুকরণের ফলে উর্বর জমি কমে যাওয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদের দখল নিয়ে সশস্ত্র সংঘাত শুরু হতে পারে, যা পরে গৃহযুদ্ধে রূপ নেয় (যেমন- সুদানের দারফুর সংকট)।
২. **জলবায়ু উদ্বাস্তু ও অভিবাসন সংকট:** সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং চরম আবহাওয়ার কারণে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। বড় আকারের অভিবাসন প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে জাতিগত দাঙ্গা, উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং সীমান্ত নিরাপত্তার অবনতি ঘটে। জলবায়ু উদ্বাস্তুরা যখন বড় শহরগুলোতে ভিড় করে, তখন সেখানে সেবা ও কর্মসংস্থানের সংকট তৈরি হয়, যা সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধ বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
৩. **খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা:** অনিয়মিত আবহাওয়া খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত করে, যা বিশ্ববাজারে খাদ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। কোনো দেশে খাদ্যের তীব্র অভাব দেখা দিলে সরকারবিরোধী আন্দোলন ও বিদ্রোহ শুরু হতে পারে (যেমন- আরব বসন্তের অন্যতম কারণ ছিল গমের দাম বৃদ্ধি)। তেল-গ্যাস থেকে নবায়নযোগ্য শক্তিতে রূপান্তরের ফলে জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশগুলোর অর্থনৈতিক পতন ঘটতে পারে, যা ওই অঞ্চলের নিরাপত্তা কাঠামোকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।

৪. **ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্যের নতুন ক্ষেত্র:** মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ায় নতুন নতুন নৌপথ উন্মুক্ত হচ্ছে এবং সেখানে থাকা খনিজ সম্পদের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠায় শক্তিধর দেশগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ছে। রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং চীন এখন উত্তর মেরুর ওপর নিজেদের প্রভাব বাড়াতে সামরিক উপস্থিতি বাড়াচ্ছে, যা একটি নতুন 'শীতল যুদ্ধ' বা স্নায়ুযুদ্ধের জন্ম দিতে পারে।

৫. **দুর্যোগ মোকাবিলায় সামরিক বাহিনীর ব্যস্ততা:** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘনঘন বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঘূর্ণিঝড়, বন্যা) ঘটছে। অনেক দেশের সামরিক বাহিনীকে এখন সীমানা রক্ষার পরিবর্তে দুর্যোগ উদ্ধারকাজে বেশি সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন সামরিক ব্যয় বাড়ছে, অন্যদিকে মূল প্রতিরক্ষা সক্ষমতা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে।

পরিশেষে, জলবায়ু পরিবর্তন কোনো কাল্পনিক ভবিষ্যৎ নয়, এটি বর্তমানের এক রূঢ় বাস্তবতা যা আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতাকে তছনছ করে দিচ্ছে। যদি এখনই কার্যকর বৈশ্বিক পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে যুদ্ধ কেবল মতাদর্শ বা সীমানা নিয়ে হবে না, বরং তা হবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পানি ও খাদ্যের জন্য। তাই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এখন আর কেবল পরিবেশগত অগ্রাধিকার নয়, বরং এটি বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রধান হাতিয়ার।

জলবায়ু কূটনীতি

ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে নিয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রক্রিয়া হলো জলবায়ু কূটনীতি। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে জলবায়ু কূটনীতি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশসমূহ, যারা জলবায়ু দূষণ ও পরিবর্তনে অধিকতর ভূমিকা রাখছে, তাদের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে সাহায্য করাই বর্তমানে জলবায়ু কূটনীতির প্রধান লক্ষ্য।

গতানুগতিক কূটনীতি থেকে স্বভাবতই জলবায়ু কূটনীতির প্রকৃতি, কৌশল, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। প্রচুর ভারী শিল্পকারখানা সমৃদ্ধ যে ধনী রাষ্ট্রসমূহ প্রতিনিয়ত CO_2, SO_2 এর মতো গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো উৎপাদন করে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করছে; তাদের এই কর্মকাণ্ডের ফলে মালদ্বীপ বা ওশেনিয়া মহাদেশের ক্ষুদ্র দ্বীপগুলো নিকট ভবিষ্যতে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে তলিয়ে যাবার শংকায় রয়েছে। সারা দুনিয়াতেই সামনের ৫০ বা ১০০ বছরে লক্ষ কোটি মানুষ জলবায়ু শরণার্থীতে পরিণত হতে যাচ্ছে। অত্যধিক কার্বন নিঃসরণকারী দেশসমূহের এ সকল ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রতি যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তা নিয়ে দর কষাকষি করা জলবায়ু কূটনীতির প্রধান সাফল্য। জলবায়ু কূটনীতির উদাহরণ: COP, UNEP গঠন, UNFCCC গঠন, Paris Act, Kyoto Protocol, Green Climate Fund গঠন ইত্যাদি।

পরিবেশগত ইস্যু

গ্রিনহাউজ ইফেক্ট

গ্রিনহাউজ ইফেক্ট বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মাত্রা দিন দিন বেড়ে যাওয়ার ফলে গ্রিনহাউজ ইফেক্ট এখন উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের (CO_2) পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে সূর্য থেকে ভূপৃষ্ঠে আগত রশ্মির মধ্যে বিদ্যমান ফোটন কণার যে তাপ তা কার্বনকে ভেদ করে পুনরায় ফিরে যেতে পারে না। ফলে বায়ুমণ্ডল প্রতিনিয়ত উষ্ণ হচ্ছে। একইভাবে, CFC বা ফ্রেয়ন গ্যাস অধিক মাত্রায় অবমুক্তির ফলে এই গ্যাস স্ট্রাটোমণ্ডলে ওজন গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে অধিক পরিমাণে ভূপৃষ্ঠে প্রবেশের সুযোগ করে দেবে যার ফলে নানা প্রকার রোগ ব্যাধি ছড়াবে। গ্রিন হাউজের অন্যান্য গ্যাসগুলো এভাবেই প্রাণিজগতের জন্য হুমকি স্বরূপ।

গ্রিনহাউজ

গ্রিনহাউজ কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। শীত প্রধান দেশে যেখানে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে থাকে সেখানে স্বচ্ছ কাচের (Glass) ছাউনিযুক্ত ঘর তৈরি করা হয়। এই ঘরকে গ্রিনহাউজ বা সবুজ ঘর বলা হয়। শীতের দিনে পরিবেশের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে থাকলেও সবুজ ঘরের ভিতর তাপমাত্রা ৩৮° সেলসিয়াস থেকে ৩৯° সেলসিয়াস (১০০°-১২০°F) এর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত থাকে। একইভাবে ভূপৃষ্ঠ বেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলকে একটি কাচের ঘরের সাথে তুলনা করা হয়। কারণ কাচের ভেতর দিয়ে সূর্য রশ্মি প্রবেশের পর প্রতিফলনের সময় সূর্য রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ঘটে ফলে কাচ ভেদ করে রশ্মি বাইরে আসতে না পেরে ভেতরে আটকে পড়ে। দ্রুত বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত কার্বন ডাই অক্সাইড তাপকে প্রতিফলিত হতে না দিয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখে, এতে সূর্য থেকে আগত তাপ এবং ভূ-কেন্দ্র থেকে নির্গত তাপ মিলে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হতে থাকে এবং ভূপৃষ্ঠে নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হয় এটিকে গ্রিনহাউজ ইফেক্ট বলে।

গ্রিনহাউজ গ্যাসসমূহ

গ্রিনহাউজ গ্যাসগুলো হলো- ক. কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), খ. মিথেন (CH_4), গ. জলীয় বাষ্প (H_2O), ঘ. ওজোন গ্যাস (O_3), ঙ. নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) এই গ্যাসগুলোকে সামগ্রিকভাবে গ্রিনহাউজ গ্যাস বলা হয়।

গ্রিনহাউজ ইফেক্টের কারণ

যে পরিবেশে মানুষ বসবাস করছে তাই ধ্বংস করছে মানুষ। বিভিন্ন কারণে গ্রিনহাউজ ইফেক্ট বা প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। নিম্নে কারণগুলো উল্লেখ করা হলো- অরণ্য নিধন (Deforestration), জীবাশ্ম জ্বালানির অবাধ ব্যবহার, অতিরিক্ত কার্বন অবমুক্তকরণ, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, কেরোসিন, ডিজেল, পেট্রোল, গ্যাসোলিন প্রভৃতির অসম্পূর্ণ দহন ইত্যাদি।

গ্রিনহাউজ ইফেক্টের ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া

পরিবেশ ও কৃষির উপর গ্রিনহাউজ গ্যাসের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত মারাত্মক। কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, জলীয় বাষ্প এবং ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বা CFC তে পরিমাণের তারতম্য ঘটলে পরিবেশ বিপর্যস্ত হবে, কৃষি ধ্বংস হবে, পৃথিবীতে খাদ্য সংকটসহ নানা প্রকার পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিবে।

পরিবেশ ও কৃষিতে গ্রিনহাউজ গ্যাসের প্রতিক্রিয়া:

১. বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়বে।
২. ওজোন গ্যাস হ্রাস পাবে।
৩. মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাবে।
৪. সামুদ্রিক জলের আয়তন প্রসারিত হবে।
৫. IDP বা অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনসংখ্যা ও জলবায়ু শরণার্থী বাড়বে।
৬. মিঠা পানিতে লোনা পানির প্রবেশ ঘটবে।
৭. কৃষি উৎপাদন হ্রাস করবে।
৮. অতিবৃষ্টি ও এসিড বৃষ্টির প্রকোপ বাড়বে।
৯. নিয়মিত বনাঞ্চল ধ্বংস হবে।
১০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাবে।
১১. নিম্নভূমির বনাঞ্চল তলিয়ে যাবে।
১২. বাস্তুসংস্থানের বিপর্যয় ঘটবে।

গ্রিনহাউজ গ্যাসের ভারসাম্যহীন মাত্রা মানব জাতির জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। গ্রিনহাউজ গ্যাসের মাত্রাধিক্যের কারণে পরিবেশ বিপর্যস্ত হবে এবং কৃষি উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে খাদ্য ঘাটতি সৃষ্টি করবে। এই গ্যাসগুলোর মাত্রাতিরিক্ত অবমুক্তির ফলে বায়ুমণ্ডলের অধিক পরিমাণে উষ্ণতা বাড়বে। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা তলিয়ে যাবে। বাস্তুহারা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। সর্বোপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ উত্তরোত্তর বেড়ে যাবে। তাই বিশ্বকে এখনই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে গ্রিনহাউজ ইফেক্ট মোকাবিলায় সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

ওজোনস্তর ক্ষয়

নীল রঙের মেছো গন্ধযুক্ত গ্যাসীয় পদার্থই হলো ওজোন। তিনটি অক্সিজেন পরমাণু নিয়ে একটি ওজোন অনুগঠিত হয়। তাই ওজোনকে অক্সিজেনের রূপভেদ বলা যেতে পারে। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে স্কোনবি (Sconbein) সর্বপ্রথম ওজোনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। গ্যাসটি বিশিষ্ট গন্ধের জন্য নামকরণ করা হয় ওজোন (গ্রিক ওজো OZO কথার অর্থ- to smell)। বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরে প্রাকৃতিক কারণে অক্সিজেন এবং অক্সিজেন পরমাণুর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজোন গ্যাস উৎপন্ন হয়, কিন্তু ট্রপোস্ফিয়ার বা আয়নোস্ফিয়ারে কখনোই ওজোন উৎপন্ন হয় না। আবার স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরে সর্বত্র ওজোনের ঘনত্ব সমান নয়। স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ১৫-৩৫ কি. মি. উচ্চতার মধ্যে ওজন গ্যাসের ঘনত্ব সর্বাধিক। বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরে সীমাবদ্ধ ওজোন গ্যাসের এই পুরো আবরণ (চাদর) কে ওজোন স্তর বা Ozon Layer বলে।

গ্যাসের এ স্তর সূর্য থেকে আগত বিভিন্ন ক্ষতিকর রশ্মি যেমন, গামা রশ্মি ইত্যাদি, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশে বাধা প্রদান করে। CFC সহ আরো কিছু গ্যাস ওজোন গ্যাসের পরমাণু গঠন ভেঙে দেয়। বায়ুমণ্ডলে CFC ও এ ধরনের অন্যান্য গ্যাস বৃদ্ধির ফলে ওজোন স্তরের ক্ষয় হয়। ফলে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি সহজে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে। যা মানুষ ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ওজোন স্তর ক্ষয় রোধ করার জন্য বিশ্বব্যাপী সচেতনতা তৈরি হয়েছে। ১৯৮৭ সালে ওজোন স্তর ক্ষয় রোধকল্পে মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব রোধে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ

প্রথম পরিবেশ সম্মেলন (১৯৬৮)

১৯৬৮ সালের ৩০ জুলাই জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)-এর ৪৫তম অধিবেশনে এবং ১৯৬৮ সালের ৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৩তম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রথম পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ৫-১৬ জুন সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের নাম ছিল জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সম্মেলন (United Nations Conference on the Human Environment)। বিশ্ব পরিবেশবাদ আন্দোলন স্টকহোম কনফারেন্স একটি মাইলফলক। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে পরিবেশকে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনীতির বৃহৎ পরিসরে দেখার সুযোগ করে দেয়। স্টকহোম কনফারেন্সের ফলে বিশ্বে পরিবেশগত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বা মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়, এমনকি অনেক দেশে জাতীয় পরিবেশ কর্ম-পরিকল্পনা বা নীতি গ্রহণ করা হয়। এ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭২ সালে UNEP (United Nations Environment Programme) গঠন করা হয়। একই বছর UNEP কর্তৃক ৫ জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৩ সাল থেকে এ দিবসটি যথারীতি পালন হয়ে আসছে।

ব্রুটল্যান্ড কমিশন (১৯৮৩)

১৯৮৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ পরিবেশ ও উন্নয়নবিষয়ক বিশ্ব কমিশন (The World Commission on Environment and Development) গঠন করে, যা ব্রুটল্যান্ড কমিশন নামেও পরিচিত। এ কমিশনকে যে তিনটি উদ্দেশ্য সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো- পরিবেশ ও উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পুনরায় পরীক্ষা করে এগুলোর উন্নতি বিধানকল্পে যে কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, সে সম্পর্কে বাস্তবসম্মত প্রস্তাবনা তৈরি করা। ১৯৮৭ সালে ব্রুটল্যান্ড কমিশন তাদের বিখ্যাত প্রতিবেদন 'Our Common Future' প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে টেকসই উন্নয়ন ধারণাটি প্রথমবারের মতো ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

মন্ট্রিল সম্মেলন (১৯৮৭)

১৯৮৭ সালে মন্ট্রিলে পরিবেশ সংক্রান্ত যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ওজোনস্তর বিনষ্টকারী দূষিত রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ট্রিল প্রটোকল নামে পরিচিত। প্রটোকলটি ১৯৮৯ সালে কার্যকর হয় এবং এখন পর্যন্ত পাঁচবার সংশোধিত হয়েছে। সংশোধনীগুলোর মাধ্যমে নতুন নতুন ওজনস্তর ক্ষয়কারী পদার্থ যুক্ত করা হয়েছে।

ধরিত্রী সম্মেলন (১৯৯২)

জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনিরোতে ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৫টি দেশের সাড়ে তিন হাজার প্রতিনিধি এতে অংশ নেয়। এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল-বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সমস্যা ও টেকসই উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সদস্য দেশগুলোকে একত্রে আনা। এ সম্মেলনের প্রধান অর্জনের মধ্যে রয়েছে এজেন্ডা-২১, রিও ডিক্লারেশন গ্রহণ এবং UNFCEC প্রতিষ্ঠা। এছাড়াও সম্মেলনে ১৯৭২ সালের ১৬ জুন স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনের ঘোষণার প্রতি পুনঃসমর্থন ব্যক্ত করা হয়। রিও ডি জেনিরোতে সম্মেলনে ২৭টি নীতিমালা অনুমোদিত হয়। তন্মধ্যে মুখ্য নীতিমালাগুলো হচ্ছে-

ক. টেকসই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হবে মানব সম্পদ।
খ. রাষ্ট্রসমূহ বিশ্ব অংশীদারত্বের চেতনায় বিশ্বের পরিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে সুস্থতা ও পূর্ণতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে।
গ. পরিবেশের অবক্ষয় বা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো বস্তু বা কার্যক্রম একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিরুৎসাহিত ও প্রতিরোধে রাষ্ট্রসমূহ কার্যকরী সহায়তা প্রদান করবে।
ঘ. রাষ্ট্রসমূহ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

Agenda-21

১৯৯২ সালের রিও কনফারেন্সে এজেন্ডা-২১ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ২১ শতককে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার জন্য এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এটি একটি ৩০০ পৃষ্ঠার দলিল। ২১ শতকের পৃথিবীকে সামনে রেখে এটি প্রণয়ন করা হয়েছিল। তাই নামকরণ করা হয়েছে Agenda-21। দলিলটি বাস্তবায়নে ১২৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রাখা হয়। ২১ শতকের সম্ভাব্য পরিবেশগত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেখানে সরকারি, বেসরকারি বা ব্যক্তি পর্যায়ে কীভাবে সমস্যাগুলো মোকাবিলা করা হবে তার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এই Agenda-21 এর কাঠামো মূলত ৪ ভাগে বিভক্ত-

- সেকশন-১: সামাজিক এবং অর্থনৈতিক।
- সেকশন-২: উন্নয়নের জন্য সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।
- সেকশন-৩: বৃহৎ অংশীদারদের ভূমিকা বৃদ্ধি।
- সেকশন-৪: বাস্তবায়নের উপায়।

Agenda-21 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য জাতিসংঘের অধীন Commission on Sustainable Development (CSD) নামক সংস্থা গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য বাংলাদেশের ফারাক্কা বাঁধ Agenda-21 এর অন্তর্ভুক্ত।

ধরিত্রী সম্মেলন+৫ (১৯৯৭)

জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯৭ সালের ২৩-২৭ জুন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে 'ধরিত্রী সম্মেলন + ৫' এর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বিশ্বের ৬১টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানগণ যোগ দেন। এ সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল-

- ধরিত্রী সম্মেলনের অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- এজেন্ডা-২১ বাস্তবায়ন মূল্যায়ন।
- টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সদস্যদের প্রতিশ্রুতি পুনঃনিশ্চিতকরণ।

এতে 'দ্য প্রোগ্রাম ফর ফারদার ইমপ্লিমেন্টেশন অব এজেন্ডা-২১' গৃহীত হয়। এছাড়াও রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়।

ধরিত্রী সম্মেলন+১০ (২০০২)

২০০২ সালের ২৬ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে দ্বিতীয় বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন বা বিশ্ব টেকসই সম্মেলন ২০০২ অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশের ক্ষতি না করে বিশ্বকে টেকসই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে এ সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পাঁচটি সেবামূলক ক্ষেত্র- পানি ও পয়োনিষ্কাশন, জ্বালানি, স্বাস্থ্য, কৃষি উৎপাদনশীলতা ও জীববৈচিত্র্যের মতো ৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এ শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনার জন্য চিহ্নিত করেন। এ সম্মেলনে আরো যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তা হলো:

ক. জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা।
খ. জীবন রক্ষাকারী চাহিদা মেটাতে দরিদ্র দেশগুলো যাতে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার একটা বিকল্প উপায় পেতে পারে তা নির্ধারণ করা।

গ. ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে দারিদ্র্য অর্ধেক কমিয়ে আনা। ধনী-দরিদ্র দেশের মধ্যকার বৈষম্য হ্রাস। বিনিয়োগ প্রবাহকে টেকসই উন্নয়নের সাথে সমন্বয় করার অঙ্গীকার।

ঘ. সকল মানুষের মর্যাদা সমুন্নত রেখে একটি মানবিক নিরপেক্ষ এবং নিরাপদ বিশ্ব সমাজ গঠন করা হবে। মানবিকতার চরম অবস্থা অনুধাবন করে মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবিক উন্নয়ন সাধন করতে পারে এমন একটি বাস্তব সম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করা হবে।

ঙ. পূর্ববর্তী পরিবেশ বিপর্যয় সংক্রান্ত ঘোষণাগুলো বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া হবে এবং বাস্তবায়িত পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা হবে।

চ. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নশীল বিশ্বের খাদ্য চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

ছ. বিশুদ্ধ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ঐকমত্য হয়। ২০১৫ সালের মধ্যে প্রজাতির বিলুপ্তির হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমানো।

রিও+২০ সম্মেলন (২০১২)

১৯৯২ সালের পরে ২০ জুন, ২০১২ সালে পুনরায় ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয় রিও+২০ সম্মেলন। এ সম্মেলনের মূল স্লোগান ছিল দুটি-

১. টেকসই উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সবুজ অর্থনীতি এবং

২. টেকসই উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি।

ফলাফল

১. 'The Future We Want' নামক ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়;

২. SDG প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়;

৩. সবুজ অর্থনীতি প্রচার।

টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে একটি আলাদা স্তম্ভ হিসেবে মেনে নেয়া হবে বলে বলা হয় এ সম্মেলনে।

COP-1

COP (Conference of the Parties) হলো UNFCCC কর্তৃক আয়োজিত জলবায়ু বিষয়ক বার্ষিক সম্মেলনের নাম। এটি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ফোরাম। কপ-১ বা প্রথম বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৮ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল, ১৯৯৫ সালে। জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ১৯৬টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল।

উদ্দেশ্য

- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বৈশ্বিক পদক্ষেপ সমন্বয় করা।
- গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্য-নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যালোচনা।
- উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা।
- জলবায়ু অর্থায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা।

COP-15

জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণের জন্য ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন এ দুই সপ্তাহব্যাপী একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা COP-15 নামে পরিচিত। এ সম্মেলনে ১৯৪টি দেশ, জলবায়ু বিশেষজ্ঞ এবং অসংখ্য পরিবেশবাদী সংগঠন অংশগ্রহণ করে। COP-15 সম্মেলনে গৃহীত চুক্তির প্রধান প্রধান দিকগুলো নিচে তুলে ধরা হলো-

১. বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমনের হার কমিয়ে আনতে হবে।

২. ২০১০ সালের শেষ নাগাদ একটি বাধ্যতামূলক আইনি চুক্তি প্রণয়ন করার জন্য সমঝোতার সঙ্গে একটি সুপারিশ সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩. উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে উন্নত দেশগুলো তাদেরকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

৪. জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, অন্যান্য দ্বীপ রাষ্ট্র, স্বল্পোন্নত দেশসমূহ এবং আফ্রিকার দেশসমূহকে। এ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে শিল্পোন্নত দেশসমূহ যৌথভাবে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১ হাজার কোটি ডলার করে সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

COP-16

মেক্সিকোর পর্যটন নগরী কানকুন সিটিতে ২০১০ সালের ডিসেম্বরে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা Conference of the Parties 16 (COP-16) নামে পরিচিত। COP-16 এ গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিম্নে দেওয়া হলো-

১. অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে Adaptation Committee প্রতিষ্ঠা।

২. যে সকল দেশে ১০টির কম Clean Development Mechanism (CDM) Project আছে সেসব দেশকে আর্থিক সহায়তা ও পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ।

৩. Green Climate Fund গঠন।

৪. COP-16 এর ANNEX-I ভুক্ত দেশসমূহ ২০১০-১১ মেয়াদে প্রতিশ্রুত ৩০ বিলিয়ন অর্থ উন্নয়নশীল দেশসমূহকে অভিযোজন খাতে প্রদান।
৫. উন্নত দেশ কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদে ২০২০ সাল হতে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সরবরাহ করা।
৬. ৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি Transitional Committee দ্বারা Green Climate fund এর গঠন চূড়ান্তকরণ।
৭. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধি নিয়ে ২৪ সদস্যের একটি বোর্ড গঠন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৮. একটি প্রযুক্তি নির্বাহী কমিটি ও একটি জলবায়ু প্রযুক্তি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে Technology Mechanism অর্থাৎ উন্নয়ন ও বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

COP-16 এর সাফল্য

১. পাশ্চাত্য থেকে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোকে তহবিল সরবরাহের ব্যবস্থা।
২. কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের বর্তমান অঙ্গীকার সম্প্রসারণ করা উচিত-এ মর্মে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি।
৩. দেশগুলোকে তাদের বনসম্পদ না কেটে রক্ষা করতে আর্থিক প্রণোদনা দেয়ার ব্যবস্থা।

COP-16 এর ব্যর্থতা

১. কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের মাত্রা বাড়ানোর অঙ্গীকার রক্ষা হয়নি।
২. কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের মাত্রা আরো কমানোর কর্মকৌশল কোনো কাজে আসেনি।
৩. নতুন বৈশ্বিক চুক্তির আইনগত মর্যাদার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও বাস্তবায়ন হয়নি।

COP – 21

২০১৫ সালের জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন, COP-21 ফ্রান্সের প্যারিসে 30 নভেম্বর থেকে 12 ডিসেম্বর 2015 পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই গৃহীত হয় ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি।

প্যারিস চুক্তি

'প্রকৃতি ও পরিবেশ' রক্ষায় এ পর্যন্ত যতগুলো চুক্তি, সম্মেলন ও সমঝোতা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্যারিস জলবায়ু চুক্তি। কেননা এর আগে কপ–২০ পর্যন্ত শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে এতটা মতৈক্য তৈরি করতে পারেনি। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের আওতায় জলবায়ু সনদ তৈরি হয়। এই প্রটোকলে ১৮৭টি দেশ স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির প্রথম পর্যায়ের মেয়াদ শেষ হয় ২০১২ সালে। আর এরই ধারাবাহিকতায় প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু নতুন করে ২০ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করলে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি হুমকির মুখে পড়ে। কারণ, কার্বন নিঃসরণকারী দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে দ্বিতীয়। উল্লেখ্য এর পূর্বে ২ জুন ২০১৭ তারিখে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র প্যারিস চুক্তি হতে বের হয়ে যায়। তবে তার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পুনরায় প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রকে যুক্ত করে।

সংক্ষেপে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি

২০১৫ সালের ডিসেম্বরে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে ১৯৭টি দেশের মধ্যে স্বাক্ষর করে ১৯৫টি দেশ। শুধু সিরিয়া ও নিকারাগুয়া চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেনি। এই চুক্তিতে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনা এবং নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনার বিষয়ে দেশগুলো নিজেরা আইন তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তবে এ প্রতিশ্রুতি পূরণে দেশগুলোর কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা প্যারিস চুক্তিতে রাখা হয়নি। ঐতিহাসিক এ চুক্তি অনুযায়ী-

- শিল্প নির্গমন মাত্রা কমিয়ে আনা হবে।
- যুক্তরাষ্ট্র তার গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন ২০২৫ সালের মধ্যে ২৬-২৮ শতাংশ কমিয়ে আনবে।
- কয়লার বদলে বিকল্প উৎসে জোর দেওয়া হবে।
- উন্নত দেশগুলো দূষণের জন্য দায়ী সেহেতু আমেরিকার মতো উন্নত দেশগুলো গরিব দেশগুলোকে বছরে ১০ হাজার কোটি ডলার সাহায্য দেবে।
- ভবিষ্যতে এই ক্ষতিপূরণ বাড়বে।

COP-30

বৈশ্বিক জলবায়ু সংকটের ক্রান্তিলগ্নে ব্রাজিলের আমাজন অববাহিকার বেলেমে আয়োজিত COP-30 (১০-২২ নভেম্বর, ২০২৫) সম্মেলনটি ছিল বিশ্ববাসীর জন্য এক পরম আকাঙ্ক্ষিত আসর। প্রকৃতির 'ফুসফুস' হিসেবে খ্যাত আমাজন বনের ভেতরে এই সম্মেলনের আয়োজন জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের আবশ্যকতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ন্যায্য পাওনা এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে এই সম্মেলনে বিশ্বের ১৯৩টি দেশের প্রতিনিধিরা একজোট হয়েছিলেন, যার মূল মন্ত্র ছিল-প্রকৃতির সাথে সন্ধি স্থাপন করে একটি বাসযোগ্য ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা।

- **COP-30-এর অফিশিয়াল স্লোগান:** 'Global Mutirão'-এটি ব্রাজিলীয় তথা Tupi-Guarani ভাষার একটি Indigenous শব্দ, যার মানে 'Collective Effort' বা 'সমষ্টিগত চেষ্টা/সবার মিলিত উদ্যোগ'। অর্থাৎ সবাই মিলে জলবায়ুর বিরুদ্ধে কাজ করা। এই স্লোগানটি COP-30-এর মূল বার্তা হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

- **অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা:** এই সম্মেলনে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের (UNFCCC) সদস্যভুক্ত প্রায় ১৯৩টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন। এর পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়নও একটি স্বতন্ত্র পক্ষ হিসেবে সম্মেলনে উপস্থিত ছিল। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বৈশ্বিক ঐকমত্য তৈরির লক্ষ্যে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই তাদের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল পাঠায়। তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মিয়ানমার, আফগানিস্তান ও স্যান মারিনো এই সম্মেলনে অংশ নেয়নি। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র এই বছরই প্রথম COP সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখে।
- **প্রতিনিধিদের মোট সংখ্যা:** সম্মেলনে সশরীরে উপস্থিত থাকা নিবন্ধিত প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৫,০০০ থেকে ৫৬,০০০ জনের মধ্যে। এর মধ্যে সরকারি প্রতিনিধি, বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ এবং পর্যবেক্ষক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আয়োজক দেশ হিসেবে ব্রাজিলের প্রতিনিধি দল ছিল সবথেকে বড়, যেখানে প্রায় ৩,৮০৫ জন সদস্য অংশ নেন। এছাড়া চীন, নাইজেরিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া থেকেও বিশাল সংখ্যক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।
- **আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ:** COP-30-এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল আদিবাসী প্রতিনিধিদের বিশাল উপস্থিতি। আমাজন বনের হৃদপিণ্ডে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রায় ৫,০০০ আদিবাসী প্রতিনিধি এখানে অংশ নেন। জলবায়ু আলোচনায় প্রান্তিক ও বননির্ভর মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক

বিপুল সংখ্যক দেশের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও এই সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি প্রতিনিধি দলের অনুপস্থিতি একটি বড় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে বিপুল সংখ্যক আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও এবং সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতিতে বেলেম শহরটি এক বিশাল বৈশ্বিক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। আবাসন সংকট মেটাতে অনেক প্রতিনিধিকে বন্দরে রাখা বড় বড় ক্রুজ শিপ বা প্রমোদতরীতে অবস্থান করতে হয়েছে।

COP-30 এর প্রধান ফোকাস/থিম

- **Adaptation (অভিযোজন):** জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় কমিউনিটি ও প্রকৃতিকে সহনশীল ও সুরক্ষিত করে তোলা।
- **Climate Finance (জলবায়ু অর্থায়ন):** উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য পর্যাপ্ত, দ্রুত ও টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করা।
- **Nature-based Solutions (প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান):** অরণ্য, জলাভূমি, মরূদ্যানসহ প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ু সমস্যার সমাধান।
- **Inclusion & Just Transition (অন্তর্ভুক্তি ও ন্যায্য রূপান্তর):** জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অধিকার, অংশগ্রহণ ও ন্যায্য শ্রম-সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
- **Implementation (বাস্তবায়ন):** প্রতিশ্রুতির গণ্ডি ছাড়িয়ে সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনাগুলোকে কার্যকরভাবে বাস্তবে রূপ দেওয়া।

COP-30 সম্মেলনে গৃহীত প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ

COP-30 সম্মেলনে গৃহীত প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। নিচে তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. **'বেলেম ঘোষণা' ও বন রক্ষা (Belém Declaration):** এই সম্মেলনের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল আমাজন রক্ষা নিয়ে হওয়া ঐতিহাসিক চুক্তি। আমাজন অববাহিকার দেশগুলো বনাঞ্চল ধ্বংস (Deforestation) শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে একটি ঐক্যবদ্ধ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে। এতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ২০৩০ সালের মধ্যে আমাজনকে ধ্বংসের হাত থেকে পুরোপুরি রক্ষা করা হবে। পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে ক্রান্তীয় বনাঞ্চল রক্ষায় একটি নতুন আন্তর্জাতিক তহবিল গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২. **উচ্চাভিলাষী এনডিসি (New NDCs 3.0):** প্যারিস চুক্তির নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৫ সাল ছিল দেশগুলোর জন্য তাদের 'ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশনস' (NDC) বা কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের নতুন পরিকল্পনা জমা দেওয়ার বছর। COP-30-তে দেশগুলো ২০৩৫ সাল পর্যন্ত কার্বন নিঃসরণ কমানোর আরও কঠোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিশেষ করে বৃহৎ অর্থনীতিসম্পন্ন দেশগুলো (G20) যাতে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পনা করে, তার ওপর সর্বোচ্চ জোর দেওয়া হয়েছে।

৩. **জলবায়ু অর্থায়ন রোডম্যাপ (Finance Roadmap):** আগের বছর (COP-29) জলবায়ু অর্থায়নের যে নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছিল, বেলেমে এসে তার একটি সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়নের রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো যাতে সহজে এবং কম সুদে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অর্থ পায়, তার জন্য বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৪. **অভিযোজন তহবিল ও লস অ্যান্ড ড্যামেজ (Adaptation & Loss and Damage):** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে (Loss and Damage), তা কাটিয়ে ওঠার জন্য একটি বিশেষ তহবিল কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ২০৩৫ সালের মধ্যে অভিযোজন তহবিল (Adaptation Fund) অন্তত তিনগুণ করতে হবে। এটি মূলত বাংলাদেশের মতো উপকূলীয় দেশগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যারা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ঝুঁকির মুখে রয়েছে।

৫. **জ্বালানি রূপান্তর (Energy Transition):** জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, তেল, গ্যাস) থেকে সরে এসে নবায়নযোগ্য জ্বালানির (সৌর ও বায়ু শক্তি) ব্যবহার তিনগুণ করার যে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল, তা বাস্তবায়নে দেশগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণে একমত হয়েছে। যদিও কিছু তেল উৎপাদনকারী দেশের আপত্তির কারণে এটি নিয়ে বিতর্ক ছিল, তবুও টেকসই জ্বালানি ব্যবহারের পক্ষে ব্যাপক সমর্থন পাওয়া গেছে।

COP-30 এর সমালোচনাসমূহ

বেলেমে অনুষ্ঠিত COP-30 (২০২৫) সম্মেলনটি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের দাবিদার হলেও এটি ব্যাপক সমালোচনার মুখেই শেষ হয়েছে। পরিবেশবাদী সংগঠন, বিজ্ঞানী এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষ থেকে আসা প্রধান সমালোচনাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১. **জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে অস্পষ্টতা:** সম্মেলনের সবচেয়ে বড় সমালোচনা ছিল চূড়ান্ত ঘোষণাপত্রে 'জীবাশ্ম জ্বালানি' (Fossil Fuels) ত্যাগের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বা জোরালো প্রতিশ্রুতির অনুপস্থিতি। প্রায় ৮০টির বেশি দেশ জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধের একটি রোডম্যাপ চাইলেও প্রভাবশালী তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর (Petrostates) বিরোধিতার কারণে চুক্তিতে বিষয়টি নমনীয় রাখা হয়েছে। পরিবেশবাদীরা একে জলবায়ু সংকটের মূল কারণ এড়িয়ে যাওয়া হিসেবে দেখছেন।

২. **যুক্তরাষ্ট্রের অনুপস্থিতি ও নেতৃত্বের অভাব:** বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ কার্বন নিঃসরণকারী দেশ হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি প্রতিনিধি দল না পাঠানো সম্মেলনের গুরুত্বকে ম্লান করেছে। এর ফলে জলবায়ু অর্থায়ন এবং বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের আলোচনা এক প্রকার স্থবির হয়ে পড়েছিল। অনেকেই মনে করেন, বড় দেশগুলোর এই রাজনৈতিক উদাসীনতা প্যারিস চুক্তির ভবিষ্যৎকে ঝুঁকিতে ফেলছে।

৩. **অর্থায়নের অনিশ্চয়তা:** উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য জলবায়ু তহবিলের অর্থ ২০৩০-এর পরিবর্তে ২০৩৫ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো একে দরিদ্র দেশগুলোর প্রতি 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলে অভিহিত করেছে। বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা কীভাবে সংগ্রহ করা হবে বা কার ওপর দায় পড়বে, সে বিষয়ে কোনো স্বচ্ছ রোডম্যাপ চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি।

৪. **বন রক্ষা তহবিলের ঘাটতি:** আমাজনের মতো রেইনফরেস্ট রক্ষার জন্য ব্রাজিল সরকার যে তহবিলের আশা করেছিল, তার প্রাপ্তি ছিল হতাশাজনক। ২৫ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাত্র ৬.৬ বিলিয়ন ডলার নিশ্চিত করা গেছে। আমাজনের ভেতরে সম্মেলন করেও বন রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করতে না পারাকে একটি বড় ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

৫. **আদিবাসীদের সীমিত প্রভাব:** সম্মেলনে রেকর্ড সংখ্যক আদিবাসী প্রতিনিধি উপস্থিত থাকলেও নীতিনির্ধারণী বা 'ব্লু জোন' (Blue Zone) আলোচনায় তাদের প্রবেশাধিকার ছিল খুবই সীমিত (মাত্র ১৪ শতাংশ)। সমালোচকদের মতে, এটি কেবল দেখানোর জন্য অংশগ্রহণ ছিল, প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তাদের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

বাংলাদেশের ভূমিকা

COP-30 সম্মেলনে বাংলাদেশ বরাবরের মতোই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর প্রধান কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছে। আমাজনের বেলেমে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সক্রিয় এবং কৌশলগত। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. **'জলবায়ু ন্যায়বিচার' (Climate Justice) দাবি:** বাংলাদেশ সম্মেলনে জোরালোভাবে তুলে ধরেছে যে, বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের অবদান নগণ্য (০.৪৮%-এর কম) হওয়া সত্ত্বেও দেশটি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ উন্নত দেশগুলোর কাছে 'ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা' স্বীকার করার এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানিয়েছে।

২. **লস অ্যান্ড ড্যামেজ (Loss and Damage) তহবিল কার্যকর করা:** বাংলাদেশ এবং অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (LDCs) প্রধান দাবি ছিল 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' তহবিল দ্রুত ছাড় করা। বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা যুক্তি দিয়েছেন যে, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় এলাকায় যে স্থায়ী ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, তা মোকাবিলায় এই তহবিল থেকে সরাসরি গ্র্যান্ট বা অনুদান দেওয়া জরুরি, ঋণ নয়।

৩. **অভিযোজন অর্থায়ন (Adaptation Finance) দ্বিগুণ করা:** বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার বা 'অভিযোজন' প্রক্রিয়ায় বিশ্বের অন্যতম রোল মডেল। সম্মেলনে বাংলাদেশ দাবি করেছে যে, ২০২৫ সালের মধ্যে উন্নত দেশগুলোকে অভিযোজন অর্থায়ন অন্তত দ্বিগুণ করতে হবে। বাংলাদেশ তার নিজস্ব 'ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' এর উদাহরণ টেনে বিশ্বকে দেখিয়েছে কীভাবে সীমিত সম্পদ দিয়েও লড়াই করা সম্ভব।

৪. **ক্লাইমেট মাইগ্রেশন বা জলবায়ু উদ্বাস্তু ইস্যু:** বাংলাদেশ এই সম্মেলনে 'জলবায়ু উদ্বাস্তু' বা ক্লাইমেট মাইগ্রেশনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উত্থাপন করেছে। প্রতি বছর বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘরবাড়ি হারাচ্ছে। এই অভিবাসীদের পুনর্বাসন ও নিরাপত্তার জন্য একটি আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশ।

৫. **প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সক্ষমতা বৃদ্ধি:** নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ কারিগরি সহায়তা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের দাবি জানিয়েছে। বিশেষ করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসল চাষ এবং সাশ্রয়ী সৌর প্রযুক্তির প্রসারে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সহযোগিতা চেয়েছে।

বাংলাদেশের বিশেষ অর্জন

সম্মেলনে বাংলাদেশ 'লিডারশিপ গ্রুপ ফর ইন্ডাস্ট্রি ট্রানজিশন'-এ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং বৈশ্বিক অভিযোজন আলোচনায় অন্যতম মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া উপকূলীয় দেশগুলোর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ নেতৃত্ব ছিল প্রশংসনীয়।

পরিশেষে বলা যায়, COP-30 কেবল একটি কূটনৈতিক সম্মেলন ছিল না, বরং এটি ছিল ধরিত্রী রক্ষার এক সাহসী অঙ্গীকার। যদিও বড় দেশগুলোর অর্থায়ন এবং জীবাশ্ম জ্বালানি ত্যাগের সীমাবদ্ধতা নিয়ে নানা সমালোচনা রয়েছে, তবুও বনাঞ্চল রক্ষা ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অধিকার আদায়ে এই সম্মেলনটি নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য এই সম্মেলনের প্রতিশ্রুতিগুলো এখন টিকে থাকার অন্যতম অবলম্বন। এই আসরে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর কার্যকর বাস্তবায়নই নির্ধারণ করবে আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও নিরাপদ পৃথিবী রেখে যেতে পারব কি না।

[বি.দ্র: ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতিবছর COP সম্মেলন হচ্ছে। কিন্তু Covid-19 এর কারণে ২০২০ সালে COP সম্মেলন হয়নি।]

বিশ্ব বাণিজ্য ও জলবায়ু সমস্যা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংলাপ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের দুটি সবচেয়ে প্রভাবশালী শক্তি। অতীতে এই দুটি বিষয়কে আলাদা করে দেখা হলেও, বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমীকরণে বাণিজ্য ও পরিবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংলাপ বা 'ক্লাইমেট নেগোসিয়েশনস' (যেমন- COP সম্মেলন) এখন আর কেবল কার্বন নিঃসরণ কমানোর আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি এখন অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার এক বিশাল রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) অধীনে 'অবাধ বাণিজ্য' (Free Trade) ছিল উন্নয়নের মূলমন্ত্র। অন্যদিকে, ১৯৯২ সালের রিও আর্থ সামিট থেকে শুরু হওয়া জলবায়ু আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষা। গত তিন দশকে দেখা গেছে, অবাধ বাণিজ্যের ফলে বৈশ্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও কার্বন নিঃসরণ বেড়েছে কয়েক গুণ। এর ফলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উপলব্ধি করেছে যে, বাণিজ্যনীতি পরিবর্তন না করে জলবায়ু সমস্যার সমাধান অসম্ভব। বাণিজ্য বিষয়ক স্বার্থগুলোই এখন নির্ধারণ করছে কোন দেশ কতটুকু কার্বন কমাতে রাজি হবে এবং কোন প্রযুক্তি কার হাতে থাকবে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সংলাপগুলো মূলত তিনটি বড় অর্থনৈতিক কারণে বাণিজ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়:

- **প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতার লড়াই (Competitiveness Gap)**: যখন কোনো দেশ জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় কঠোর নিয়ম জারি করে (যেমন- কার্বন ট্যাক্স), তখন সেই দেশের শিল্পকারখানার উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। এর ফলে তারা আন্তর্জাতিক বাজারে এমন দেশের কাছে হেরে যেতে পারে যারা কোনো পরিবেশ আইন মানে না। আন্তর্জাতিক সংলাপে উন্নত দেশগুলো তাই দাবি তোলে যে, জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা সবার জন্য সমান হতে হবে, যাতে কেউ বাণিজ্যে অনৈতিক সুবিধা না পায়।
- **কার্বন লিকেজ (Carbon Leakage)**: বাণিজ্যের ভাষায় কার্বন লিকেজ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কঠোর পরিবেশ আইন থেকে বাঁচতে কোম্পানিগুলো তাদের কারখানা উন্নত দেশ থেকে সরিয়ে উন্নয়নশীল দেশে নিয়ে যায়। এতে বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ কমে না, শুধু বাণিজ্যের মানচিত্র বদলে যায়। আন্তর্জাতিক সংলাপে এটি একটি বড় বিতর্কের বিষয়। উন্নত দেশগুলো চায় এমন এক বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থা যেখানে পরিবেশ দূষণকারী পণ্যের ওপর উচ্চ শুল্ক থাকবে, যাতে কোম্পানিগুলো পালানোর পথ না পায়।
- **ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা বনাম অর্থনৈতিক উন্নয়ন**: ভারত, চীন ও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো বাণিজ্যের স্বার্থে সংলাপে শক্ত অবস্থান নেয়। তাদের যুক্তি হলো, উন্নত দেশগুলো কয়লা পুড়িয়েই আজ ধনী হয়েছে। এখন যদি বাণিজ্যে পরিবেশগত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়, তবে তাদের শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হবে। একে সংলাপে 'Common But Differentiated Responsibilities' (CBDR) বলা হয়, যা বাণিজ্যের সমতা নিয়ে এক বিশাল বিতর্ক সৃষ্টি করে।

বিশ্ব বাণিজ্য নীতি ও জলবায়ু সংলাপের গতিপথ

আন্তর্জাতিক সংলাপে বাণিজ্যের প্রভাব মূলত চারটি প্রধান কৌশলের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়।

- **কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম (CBAM) বা গ্রিন ট্যারিফ**: বর্তমানে জলবায়ু সংলাপের সবচেয়ে আলোচিত এবং বিতর্কিত বিষয় হলো CBAM। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এটি প্রবর্তন করেছে। এর মাধ্যমে তারা এমন সব দেশ থেকে পণ্য আমদানিতে অতিরিক্ত শুল্ক বসাবে যাদের পরিবেশ আইন শিথিল। এটি কেবল একটি কর নয়, এটি একটি বাণিজ্যিক অস্ত্র। এর ফলে রপ্তানিকারক দেশগুলো (যেমন- দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক, ভারত) বাধ্য হয়ে তাদের নিজস্ব শিল্পকারখানাকে সবুজ বা গ্রিন প্রযুক্তিতে রূপান্তর করতে বাধ্য হচ্ছে। সংলাপে অনেক দেশ একে 'সবুজ সংরক্ষণবাদ' (Green Protectionism) বলে সমালোচনা করছে, কারণ এটি অবাধ বাণিজ্যের মূলনীতির পরিপন্থি হতে পারে।
- **মেধাস্বত্ব অধিকার (IPR) ও প্রযুক্তি হস্তান্তর**: জলবায়ু সংকট সমাধানে 'গ্রিন টেকনোলজি' (যেমন- সোলার প্যানেল, উইন্ড টারবাইন, গ্রিন হাইড্রোজেন) অপরিহার্য। কিন্তু এই প্রযুক্তির মালিকানা মূলত উন্নত দেশগুলোর হাতে। বাণিজ্য চুক্তির অধীনে থাকা TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) আইনের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলো সহজে এই প্রযুক্তি পায় না। আন্তর্জাতিক সংলাপে উন্নয়নশীল দেশগুলো দাবি করে যে, প্রাণরক্ষাকারী ওষুধের মতো জলবায়ু রক্ষাকারী প্রযুক্তিকেও বাণিজ্যের কঠিন মেধাস্বত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে। এটি নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে সংলাপে সবসময় এক ধরনের অচলাবস্থা বিরাজ করে।
- **সবুজ ভর্তুকি (Green Subsidies) ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা**: ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্র Inflation Reduction Act (IRA) পাস করে, যেখানে তারা তাদের দেশের বৈদ্যুতিক গাড়ি ও ব্যাটারি শিল্পে প্রায় ৩৭০ বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি দেওয়ার ঘোষণা দেয়। এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বড় ধরনের কম্পন সৃষ্টি করেছে। ইউরোপ ও চীন অভিযোগ করেছে যে, এটি প্রতিযোগিতার পরিবেশ নষ্ট করছে। আন্তর্জাতিক জলবায়ু সংলাপে এখন প্রশ্ন উঠছে-পরিবেশ রক্ষার নামে একটি দেশ কি তার নিজস্ব শিল্পকে অন্যায্য বাণিজ্যিক সুবিধা দিতে পারে? এটি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) নিয়মের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ছে।
- **ক্লাইমেট ফাইন্যান্স ও বাণিজ্যিক বিনিয়োগ**: জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এই অর্থের প্রবাহ বাণিজ্যের সাথে যুক্ত। উন্নত দেশগুলো এই অর্থ সরাসরি অনুদান হিসেবে না দিয়ে অনেক সময় বাণিজ্যিক ঋণ বা বিনিয়োগ (Green Bond) হিসেবে দিতে চায়। সংলাপে এটি নিয়ে বড় ধরনের মতবিরোধ থাকে, কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলো একে নতুন ধরনের বাণিজ্যিক শোষণ হিসেবে দেখে।

বাণিজ্যের মাধ্যমে জলবায়ু সমস্যা সমাধানের নতুন মডেল

সংলাপগুলোতে কেবল বিরোধ নয়, বাণিজ্যের মাধ্যমে সমাধানের কিছু ইতিবাচক পথও উঠে আসছে।

- **সবুজ পণ্য তালিকা (Environmental Goods Agreement)**: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বর্তমানে এমন একটি তালিকা নিয়ে আলোচনা চলছে যেখানে সোলার প্যানেল, পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্রপাতি এবং সাইকেলের মতো পরিবেশবান্ধব পণ্যের ওপর থেকে সারা বিশ্বে সব ধরনের শুল্ক তুলে নেওয়া হবে। এটি কার্যকর হলে বাণিজ্যের মাধ্যমেই বিশ্ব দ্রুত সবুজায়নের দিকে যাবে।
- **কার্বন বাজার (Carbon Markets)**: প্যারিস জলবায়ু চুক্তির ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে কার্বন বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে একটি দেশ বা কোম্পানি অন্য দেশের কার্বন কমানোর প্রকল্পে বিনিয়োগ করে তা নিজের 'কার্বন ক্রেডিট' হিসেবে কিনতে পারে। এটি জলবায়ু ও বাণিজ্যের এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ একটি রপ্তানিমুখী দেশ হিসেবে এই বৈশ্বিক বাণিজ্য ও জলবায়ু সংলাপের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রয়েছে।

- **তৈরি পোশাক শিল্প**: বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে পোশাক খাত থেকে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন পরিবেশ নীতিমালা অনুযায়ী, বাংলাদেশের কারখানাগুলোকে এখন বিপুল অর্থ ব্যয় করে 'গ্রিন ফ্যাক্টরি'তে রূপান্তর করতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংলাপে বাংলাদেশ তাই প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তার দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরছে।
- **Loss and Damage Fund**: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়লে বাংলাদেশের কৃষি জমি ও অবকাঠামো ধ্বংস হবে, যা রপ্তানি সক্ষমতা কমিয়ে দেবে। তাই বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লভ্যাংশের একটি অংশ 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড' হিসেবে দাবি করছে।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্ব বাণিজ্য এবং জলবায়ু সমস্যা বর্তমান বিশ্বের একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বাণিজ্যের স্বার্থকে উপেক্ষা করে যেমন জলবায়ু সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, তেমনি পরিবেশকে ধ্বংস করে বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি আর টেকসই হবে না।

High Seas Treaty

বিশ্ব মহাসাগর রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি 'High Seas Treaty' ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে কার্যকর হতে যাচ্ছে। ৬০তম দেশ হিসেবে মরোক্কো এই চুক্তি অনুমোদন দেওয়ায় এটি এখন আইনে পরিণত হয়েছে। দুই দশকের আলোচনার পর স্বাক্ষরিত এই চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পানি সীমার একটি বড় অংশকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকায় রূপান্তর করা হবে। বর্তমানে উচ্চ সমুদ্রের মাত্র ১ শতাংশ সুরক্ষিত, যা সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যকে ঝুঁকিতে ফেলছে। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মহাসাগর এই চুক্তির আওতায় আসবে এবং বাধ্যতামূলক নিয়মে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

বিশ্বব্যাপী অতিরিক্ত মাছ ধরা, জাহাজ থেকে দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্র উষ্ণ হয়ে সামুদ্রিক প্রাণীরা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংঘের তথ্য অনুযায়ী, সমুদ্রের প্রায় ১০ শতাংশ প্রজাতি এখন বিলুপ্তির ঝুঁকিতে। বিশেষজ্ঞরা এটিকে 'ঐতিহাসিক মাইলফলক' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বিশ্ব প্রকৃতি তহবিল ও গ্রীন পিচ একে মহাসাগর রক্ষার জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছে। তারা বলেছে, এই চুক্তি প্রমাণ করেছে পরিবেশ সুরক্ষায় দেশগুলো একসাথে কাজ করতে পারে। চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর সদস্যদেশগুলো নির্দিষ্ট অঞ্চল সংরক্ষণের প্রস্তাব দিবে এবং অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর ভোটে তা অনুমোদিত হবে। যদিও প্রতিটি দেশ নিজস্ব পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করবে, তবুও অন্য দেশগুলো আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে।

পরিবেশ বিষয়ক প্রটোকলসমূহ

মন্ট্রিল (কানাডা) প্রটোকল

এটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৮৭ সালে এবং কার্যকর হয় ১৯৮৯ সালে। এর সদস্য সংখ্যা ১৯৭ টি দেশ। এই প্রটোকলটি বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরে অবস্থিত ওজোনস্তর রক্ষা বিষয়ক। ১৯৯৬ সালের মধ্যে সিএফসি হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট বাংলাদেশ মন্ট্রিল প্রটোকলে স্বাক্ষর করে। ১৬ সেপ্টেম্বর এ প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয় বিধায় ১৬ সেপ্টেম্বর ওজোনস্তর রক্ষা দিবস। এ পর্যন্ত পাঁচবার এটি সংশোধিত হয়েছে। ৫ম সংশোধনী আনা হয় ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর রুয়ান্ডার কিগালিতে।

কিয়োটো (জাপান) প্রটোকল

সাধারণ অর্থে কিয়োটো প্রটোকল জাতিসংঘের ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change) সংক্রান্ত একটি বহুপাক্ষিক চুক্তি। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর জন্য স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে কার্যকর হয়। নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত বিশ্বে ১৯২টি (ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ) দেশ উক্ত প্রটোকল অনুসমর্থন (Rectified) করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৩৭টি উন্নয়নশীল দেশ। USA, Canada, South Sudan প্রটোকল অনুসমর্থন করেনি। ২০১২ সালে Canada নিজেকে Kyoto Protocal হতে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। চীন এবং ভারত গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনে অন্যতম শীর্ষে থাকলেও তাদের ক্ষেত্রে নির্গমন মাত্রা প্রযোজ্য নয়।

কিয়োটো প্রটোকলের মূলনীতি (Main Principles of Kyoto protocol)

'United Nations Framework Convention of Climate Change' (UNFCCC) এর অধীন কিয়োটো প্রটোকলের মূলনীতি ৬ টি। যথা:

১. কিয়োটো প্রটোকল সরকার কর্তৃক লিখিত এবং জাতিসংঘের অধীন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হবে।
২. স্বাক্ষরকৃত রাষ্ট্রসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। যথা:
   ক. শিল্পোন্নত দেশসমূহ যাদের গ্যাস নির্গমন হ্রাস বাধ্যতামূলক; এবং
   খ. শিল্পে অনগ্রসর দেশসমূহ কর্তৃক গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন বাধ্যতামূলক নয়।
৩. যে সকল শিল্পোন্নত দেশ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিয়োটো প্রটোকল কর্তৃক নির্ধারিত গ্যাস নির্গমন হ্রাসের মাত্রা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয় তাহলে শাস্তি হিসেবে পরবর্তী টার্গেটে তাকে ৩০% গ্যাস নির্গমন হ্রাস করতে হবে।
৪. সকল শিল্পোন্নত দেশসমূহকে ২০১২ সালের মধ্যে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের মাত্রা সংশ্লিষ্ট দেশের ১৯৯০ সালের মধ্যে নির্গমনের মাত্রার চেয়ে ৫ শতাংশ কমাতে হবে।
৫ কিয়োটো প্রটোকলে Flexible Mechanism অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশ গ্যাস নির্গমন কমাতে না পারলে তার পরিবর্তে নির্ধারিত আর্থিক ক্ষতিপূরণ অন্যান্য অনগ্রসর দেশগুলোকে প্রদান করবে।
৬. কিয়োটো প্রটোকলের মাধ্যমে জার্মানির বনভিত্তিক Clean Development Mechanism - CDM Project - প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই কর্তৃপক্ষ আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাত্রা নির্ধারণ করবে এবং CDM Project - এর আওতায় যথাযোগ্য অনগ্রসর রাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণের অর্থ সহায়তা প্রদান করবে।

কিয়োটো প্রটোকলের উদ্দেশ্যে (Objectives of Kyoto)

কিয়োটো প্রটোকলের মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের মাত্রা সহনশীল রাখা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের মাত্রা ৫% হারে বেড়ে চলেছে। তা পৃথিবীকে এক সময় ধ্বংস করে দিতে পারে। Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) নামক সংস্থার প্রতিবেদন মোতাবেক ২১০০ সাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তা ৫-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। কিন্তু কিয়োটো প্রটোকলের বিধান মেনে চললে ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা গড়ে ০.০২ ডিগ্রি থেকে ০.২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এ প্রটোকলের ১৭ অনুচ্ছেদে Carbon Trading এর নিয়মনীতি উল্লেখ রয়েছে।

কার্টাগেনা প্রটোকল

কার্টাগেনা প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয় ১৬ মে, ২০০০ সালে এবং কার্যকর হয় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে। প্রটোকলটি কানাডার মন্ট্রিলে স্বাক্ষরিত হয়। এর মোট সদস্য সংখ্যা ১৭০টি, এটি মূলত জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি। এখন পর্যন্ত ১৭৩টি দেশ এ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ কার্টাগেনা প্রোটোকল অনুসমর্থন করে ২০০৪ সালে।

পরিবেশ বিষয়ক কনভেনশন

রামসার (ইরান) কনভেনশন	রামসার কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭১ সালে এবং কার্যকর হয় ১৯৭৫ সালে। জলাভূমির প্রাণিবৈচিত্র্য রক্ষার্থে ১৯৭১ সালে ইরানের রামসারে The Ramsar Convention বা Convention on Wetlands স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের সুন্দরবন ১৯৯২ সালের ২১ মে ও টাঙ্গুয়ার হাওর ২০০২ সালের ২০ জানুয়ারি রামসার তালিকাভুক্ত হয়।
ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া) কনভেনশন	ভিয়েনা কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয় ১৯৮৫ সালে এবং কার্যকর হয় ১৯৮৮ সালে। ওজোন স্তর সুরক্ষার কথা বলা হয় এই কনভেনশনে। এ কনভেনশন ১৯৭টি দেশ অনুমোদন করেছে। বাংলাদেশ (অস্ট্রিয়া) ভিয়েনা কনভেনশনে স্বাক্ষর করে ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট।
বাসেল (সুইজারল্যান্ড) কনভেনশন	বাসেল কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয় ১৯৮৯ সালে এবং কার্যকর হয় ১৯৯২ সালে। বিপজ্জনক বর্জ্য দেশের সীমান্তের বাইরে চলাচল নিয়ন্ত্রণ এ চুক্তির মূল বিষয়। ১৮৪টি রাষ্ট্র এ কনভেনশনের পক্ষ হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে ১৯৯৩ সালে।
জীববৈচিত্র্য কনভেনশন (ব্রাজিল)	জীববৈচিত্র্য কনভেনশনের পুরো নাম The Convention on Biological Diversity (CBD) বা Bio-Diversity Convention. এটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯২ সালে এবং কার্যকর হয় ১৯৯৩ সালে। অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষি প্রযুক্তিতে ব্যাপক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে পৃথিবী থেকে হাজার হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে Food Chain বা খাদ্য শৃঙ্খলাতে জীববৈচিত্র্য ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বের জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির মুখে। এই মারাত্মক অবস্থা থেকে উত্তরণে ৫ জুন ১৯৯২ সালে 'রিও ডি জেনিরো' তে জীববৈচিত্র্য কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয় এবং ২৯ নভেম্বর ১৯৯৩ এ কনভেনশন বাস্তবায়ন করা হয়।

UNCCD (ফ্রান্স)	UNCCD এর পূর্ণনাম United Nations Convention to Combat Desertification. এটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৪ সালে প্যারিসে এবং কার্যকর হয় ১৯৯৬ সালে। এ কনভেনশনে ১৯৭টি জাতি পক্ষ হয়েছে (১৯৬ দেশ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন)। ২০০৬ সালকে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অব দ্য ডিজার্ট অ্যান্ড ডিজার্টিফিকেশন ঘোষণা করা হয়।
রটারডাম (নেদারল্যান্ডস) কনভেনশন	রটারডাম কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৮ সালে এবং কার্যকর হয় ২০০৪ সালে। মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষার কথা চিন্তা করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় ক্ষতিকর কেমিক্যাল ও কীটনাশক ব্যবহার দূর করতে নেদারল্যান্ডের রটারডামে Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade of the Rotterdam Convention স্বাক্ষরিত হয়। ৭২টি দেশ এই কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে।

পরিবেশবাদী সংগঠন

গ্রিনপিস (GreenPeace)

গ্রিনপিস মূলত নেদারল্যান্ডের আমস্টারডামভিত্তিক আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংস্থা। এটি ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষার পর বিশ্ব যখন পরিবেশ নিয়ে আতঙ্কিত তখনই আবার দ্বিতীয় পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর প্রক্রিয়া গ্রহণ করলে তার প্রতিবাদে ১৯৭০ সালে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে 'Don't Make A Wave Committee' গঠিত হয়। ১৯৭১ সালে নাম পরিবর্তন করে গ্রিনপিস রাখা হয়। গ্রিনপিসের প্রথম আঞ্চলিক সদর দপ্তর স্থাপিত হয়- অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড (১৯৭৪); বর্তমানে বিশ্বের ৪১টি দেশে এর আঞ্চলিক সদরদপ্তর রয়েছে।

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

জাতিসংঘের এই পরিবেশবাদী সংস্থাটি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশ্বের সর্বোচ্চ সংস্থা যা ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা (UNEP) ও জলবায়ু বিষয়ক সংস্থা (WMO) এর সম্মিলিত রূপে IPCC গঠিত হয়। এর লক্ষ্য হলো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সরকারকে সর্বস্তরের বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহ করা যাতে তারা জলবায়ুর নীতিগুলোর উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারে। IPCC এর প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনায় একটি প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করে। এর নির্দিষ্ট কোনো সদর দপ্তর নেই। IPCC শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে ২০০৭ সালে।

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)

জাতিসংঘের পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৩-১৪ জুন, ১৯৯২, রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল; কার্যকর- ২১ মার্চ, ১৯৯৪; সদর দপ্তর বন, জার্মানি; বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে- ৯ জুন, ১৯৯২ এবং অনুমোদন করে- ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৪।

UNEP (United Nations Environment Programme)

জাতিসংঘের পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি যা প্রতিষ্ঠা হয়- ৫ জুন, ১৯৭২; সদর দপ্তর- নাইরোবি, কেনিয়া। ২০০৪ সাল থেকে সংস্থাটি পরিবেশ নিয়ে ইতিবাচক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মাননা 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' পদক প্রদান আরম্ভ করে।

IUCN (International Union for the Conservation of the Nature)

আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচি যা প্রতিষ্ঠা হয়- ৫ অক্টোবর, ১৯৪৮; এর সদর দপ্তর- গ্লান্ড, সুইজারল্যান্ড।

পরিবেশ বিষয়ক তহবিল

Green Climate Fund (GCF)

GCF হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য UNFCCC এর অধীন একটি আন্তর্জাতিক তহবিল। COP-15 (কোপেনহেগেন চুক্তি) অনুযায়ী ২০১০ সালে GCF প্রবর্তন করা হয় এবং ২০১৫ সালে কার্যক্রম শুরু করে। GCF এর সদর দপ্তর: ইনচন, দক্ষিণ কোরিয়া।

লক্ষ্যসমূহ

১. উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করতে সহায়তা করা।
২. গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করতে টেকসই প্রকল্প বাস্তবায়ন।
৩. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও অবকাঠামো গড়ে তোলা।

আর্থিক কাঠামো

- **প্রাথমিক লক্ষ্য:** বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার।
- **পোর্টফোলিও এর আকার:** ১৯.৩ বিলিয়ন ডলার (২০২৫ পর্যন্ত)।
- **বরাদ্দ পদ্ধতি:** দেশগুলো অর্থায়নের জন্য সরাসরি আবেদন করতে পারে।

Loss & Damage Fund (LDF)

LDF হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল, যা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে। অভিযোজন (Adaptation) এবং প্রশমনের (Mitigation) এর মাধ্যমে প্রতিরোধ সম্ভব নয় এমন ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা করা এই তহবিলের লক্ষ্য। এ তহবিলটি 'জলবায়ু ক্ষতিপূরণ' ধারণাকে স্বীকৃতি দেয়।

প্রেক্ষাপট

- COP-27 (২০২২, মিশর) এ দীর্ঘ আলোচনার পর LDF গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।
- COP-28 (২০২৩, সংযুক্ত আরব আমিরাত) এ LDF এর কার্যক্রম শুরু করতে বিশ্বব্যাংককে অস্থায়ী ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

উদ্দেশ্য: জলবায়ু পরিবর্তনের অনিবার্য ও অপরিবর্তনীয় প্রভাব ক্ষতিগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

তহবিল বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা

- **প্রাথমিক লক্ষ্য** : বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার
- **প্রদানকারী** : উন্নত দেশ বেসরকারি খাত ও স্বেচ্ছাসেবী আবেদন
- **অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দেশ** : (i) স্বল্পোন্নত দেশ (LDCs); (ii) ক্ষুদ্র দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র (SIDS); (iii) আফ্রিকান দেশগুলো

প্রাপ্তির শর্ত: দেশগুলোকে প্রমাণ করতে হবে যে ক্ষয়ক্ষতি জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি ফল।

পরিবেশ বিষয়ক পদক

চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ

জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ'। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) ২০০৪ সালে পদকটি প্রবর্তন করে। 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' পদকটি চারটি ক্যাটাগরিতে প্রদান করা হয়। যথা: পলিসি, বিজ্ঞান, ব্যাবসা ও সুশীল সমাজ। প্রতি বছর পদকটি পেয়ে থাকেন পরিবেশ বিষয়ে অসামান্য অবদান রাখা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ' পদককে পরিবেশ বিষয়ের নোবেল বিবেচনা করা হয়।

গোল্ডম্যান এনভায়রনমেন্টাল প্রাইজ

পরিবেশ বিষয়ক বিশ্বের সবচেয়ে বড় পুরস্কার গোল্ডম্যান এনভায়রনমেন্টাল প্রাইজ। গ্রিন নোবেল নামে খ্যাত এই পদকটি প্রদান করে গোল্ডম্যান এনভায়রনমেন্টাল ফাউন্ডেশন, যা ১৯৮৯ সালে রিচার্ড এন গোল্ডম্যান ও তার স্ত্রী রোড এইচ গোল্ডম্যান প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদরদপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিকোতে অবস্থিত। এটি ১৯৯০ সাল থেকে এই পদক প্রদান আরম্ভ করে।

কার্বন বাণিজ্য (Carbon Trade)

বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন বাস্তবতা হচ্ছে কার্বন বাণিজ্য। বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইড কম নিঃসরণের জন্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি ক্রেডিট বিনিময়ের নাম কার্বন বাণিজ্য। কিয়োটো প্রটোকলে শিল্পোন্নত দেশগুলোকে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের একটি নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। একটি রাষ্ট্র তাদের কোটার চেয়ে বেশি কার্বন নির্গমনের অধিকার কিনতে হবে কম কার্বন নির্গমনকারী রাষ্ট্রের কাছ থেকে।

কার্বন বাণিজ্যের সর্বপ্রথম সূত্রপাত হয় ১৯৯৭ সালের, ১১ ডিসেম্বর কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষরের পর। সক্ষমতা সত্ত্বেও যে সব কোম্পানি কম দূষণ করে, তারা তাদের অব্যবহৃত দূষণের অধিকার বেশি দূষণকারী কোম্পানির কাছে অর্থের বিনিময়ে লেনদেন বা বিক্রয় করে থাকে। এই প্রক্রিয়া একটি রেগুলেটরি কাঠামোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে যে, ক্রেতা কোম্পানি বা দেশটি তার ক্ষেত্রে বেধে দেওয়া নির্ধারিত সীমার মধ্যে কার্বন নিঃসরণ করছে কি না।

'কার্বন ট্রেডিং-মুক্তি নয়, বরং ফাঁদ'

কার্বন ট্রেডিং (Carbon Trading) বা কার্বন বাজারের ধারণাটি মূলত পরিবেশ রক্ষার একটি অর্থনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে পরিচিতি পেলেও, অনেক পরিবেশবিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদ একে একটি 'বিপজ্জনক ফাঁদ' হিসেবে অভিহিত করেন। তাঁদের মতে, এটি প্রকৃত কার্বন নিঃসরণ কমানোর চেয়ে দূষণ করার অধিকার কেনাবেচার একটি আইনি মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। নিচে কার্বন ট্রেডিং কেন জলবায়ু মুক্তির পথ নয় বরং একটি ফাঁদ, তা ব্যাখ্যা করা হলো:

১. **দূষণ চালিয়ে যাওয়ার 'লাইসেন্স'**: কার্বন ট্রেডিং ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো এটি বড় বড় শিল্পোন্নত দেশ এবং কোম্পানিগুলোকে তাদের দূষণকারী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার একটি নৈতিক ও আইনি বৈধতা দেয়। কোনো কোম্পানি সরাসরি তার কারখানা থেকে নিঃসরণ না কমিয়ে কেবল অন্য কোনো দেশে গাছ লাগিয়ে বা নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পে বিনিয়োগ করে সেই 'ক্রেডিট' কিনে নিতে পারে। এর ফলে মূল উৎস থেকে কার্বন নিঃসরণ কমে না, বরং কোম্পানিগুলো টাকা দিয়ে 'দূষণ করার অনুমতি' কিনে নেয়।

২. **নেট জিরো বনাম রিয়েল জিরো (ফাঁকি দেওয়ার কৌশল)**: কার্বন ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে কোম্পানিগুলো 'Net Zero' বা নিট শূন্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দাবি করে। কিন্তু পরিবেশবাদীদের মতে আমাদের প্রয়োজন 'Real Zero'। কার্বন ট্রেডিংয়ের ফাঁদে পড়ে কোম্পানিগুলো দাবি করে যে তারা নিঃসরণ শোষণ করে নিচ্ছে (যেমন গাছ লাগিয়ে), কিন্তু বাস্তবে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এটি মূলত একটি গাণিতিক হিসাবের খেলা, যা প্রকৃত জলবায়ু সংকটকে আড়াল করে।

৩. **গ্রিনওয়াশিং (Greenwashing)**: অনেক বড় বড় জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনকারী কোম্পানি কার্বন ট্রেডিংকে তাদের ব্র্যান্ড ইমেজ উন্নত করার হাতিয়ার বা 'গ্রিনওয়াশিং' হিসেবে ব্যবহার করে। তারা কার্বন ক্রেডিট কিনে নিজেদের 'পরিবেশবান্ধব' হিসেবে প্রচার করে, অথচ তাদের মূল ব্যাবসা এখনও তেল, কয়লা বা গ্যাসের ওপরই নির্ভরশীল। এটি সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানোর আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়।

৪. **উন্নয়নশীল দেশের ওপর দায় চাপানো**: কার্বন ট্রেডিং অনেক সময় উন্নত দেশগুলোর দায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর চাপানোর একটি কৌশলে পরিণত হয়। ধনী দেশগুলো তাদের দেশের বড় কারখানাগুলো বন্ধ না করে দরিদ্র দেশগুলোতে বনায়ন বা সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রেডিট সংগ্রহ করে। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিল্পায়ন বা ভূমির ব্যবহারের ওপর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ চলে আসে, যা এক ধরনের 'কার্বন উপনিবেশবাদ' (Carbon Colonialism) তৈরি করে।

৫. **পরিমাপ ও তদারকির জটিলতা**: কার্বন ক্রেডিটের সঠিক হিসাব রাখা অত্যন্ত কঠিন। একটি বন কতটুকু কার্বন শোষণ করছে বা সেই বনটি ভবিষ্যতে দাবানলে পুড়ে যাবে না-তার কোনো গ্যারান্টি নেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, একই বনের ক্রেডিট একাধিকবার বিক্রি করা হয়েছে অথবা এমন প্রকল্পের ক্রেডিট বিক্রি করা হয়েছে যা পরিবেশের কোনো বিশেষ উপকার করছে না। এই স্বচ্ছতার অভাব কার্বন ট্রেডিংকে একটি বিশাল দুর্নীতির ফাঁদে পরিণত করেছে।

কার্বন ট্রেডিং জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ত্যাগ করার পরিবর্তে বাজারভিত্তিক একটি বিকল্প তৈরি করে সময়ক্ষেপণ করছে। এটি বড় দূষণকারীদের জন্য মুক্তির পথ নয়, বরং একটি আইনি ফাঁদ যা প্রকৃত পরিবর্তনকে বাধাগ্রস্ত করছে। যদি সরাসরি কার্বন নিঃসরণ কমানোর ওপর জোর না দেওয়া হয়, তবে এই ক্রেডিট কেনাবেচা পৃথিবীর উত্তাপ কমাতে ব্যর্থ হবে।

কার্বন কর (Carbon Tax)

কার্বন কর বা কার্বন ট্যাক্স হলো পণ্য বা সেবা উৎপাদনের ফলে নির্গত কার্বনের উপর ধার্যকৃত কর বা ট্যাক্স। কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদনের জন্য তথা পরিবেশ দূষিত করার জন্য জ্বালানি ব্যবহারকারীকে যে ট্যাক্স দিতে হয় সাধারণত তাকেই কার্বন ট্যাক্স হিসাবে গণ্য করা হয়। ৯০-এর দশকে ফিনল্যান্ড সর্বপ্রথম কার্বন কর চালু করে। এরপর ২০১২ সালে অস্ট্রেলিয়া কার্বন কর চালু করে।

কার্বন কর চালু করার উদ্দেশ্য

- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা।
- স্বল্প ব্যয়ে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমানো।
- জনগণকে কার্বন সম্পন্ন জ্বালানি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা।
- গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে কর থেকে সাহায্য প্রদান করা।
- বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাসকরণ।
- গ্রিনহাউজ ইফেক্টের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের রক্ষা করা।
- এই কর আরোপ করা হলে দেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেতে পারে।

কার্বন করের নেতিবাচক প্রভাব

- কার্বন কর আরোপ করা হলে জ্বালানি ব্যবহারকারী কোম্পানি গুলো বন্ধ হয়ে যাবে।
- মানুষের বেকারত্ব বেড়ে যেতে পারে।
- মানুষের ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কমে যাবে এবং গাড়ি শিল্প ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।
- অনেক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে।

Carbon Offsetting

কার্বন অফসেটিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকার নিজেদের কার্বন নিঃসরণ কমাতে না পারলে সমপরিমাণ কার্বন অন্য কোথাও কমিয়ে আনে বা শোষণ করে। এটি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নিঃসরণ হ্রাসের একটি জনপ্রিয় কৌশল। **উদাহরণ**- একটি এয়ারলাইন কর্তৃক ১ টন CO_2 নিরঃসরণের জন্য ১ টন CO_2 শোষণকারী বৃক্ষরোপণ প্রকল্পে বিনিয়োগ। দুইটি উপায়ে কার্বন অফসেটিং করা হয়।

১. প্রাকৃতিক কার্বন ক্যাপচার প্রকল্প। যেমন: বনায়ন।

২. পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য শক্তি। যেমন: সৌরশক্তির ব্যবহার।

কার্বন অফসেটিং বাস্তবায়নের উপায়

১. প্রত্যক্ষ অফসেটিং। যেমন: কোম্পানির নিজস্ব বনায়ন;
২. অপ্রত্যক্ষ অফসেটিং। যেমন: কার্বন ক্রেডিট ক্রয়;
৩. অভিযোজনভিত্তিক অফসেটিং। যেমন: জলবায়ু সহনশীল কৃষি উন্নয়ন।

সবুজ অর্থায়ন (Green Finance)

সবুজ অর্থায়ন হলো এমন একটি আর্থিক সেবা, যা টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং পরিবেশ সুরক্ষাকে সমর্থন করে। এর মূল লক্ষ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে পরিবেশগত দায়বদ্ধতার সমন্বয় করা।

উপাদান: ১. গ্রিন বন্ড; ২. পরিবেশ বান্ধব ঋণ (Green Loan); ৩. কার্বন ট্রেডিং; ৪. গ্রিন ইন্স্যুরেন্স ও ৫. ESG বিনিয়োগ।

উদাহরণ: ইউরোপীয় ইউনিয়ন গ্রিন ডিলের মাধ্যমে ১ ট্রিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে।

নমুনা লিখিত প্রশ্ন

০১. কার্বন কর কাকে বলে? এর নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
০২. জলবায়ু নিরাপত্তা কী? এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
০৩. COP-30 সম্মেলনে বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করুন।
০৪. জলবায়ু পরিবর্তন কী? জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব রোধে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ সমূহ বর্ণনা করুন।
০৫. কার্বন ট্রেডিং কি? পরিবেশ রক্ষার্থে কার্বন ট্রেডিং পদ্ধতির যৌক্তিকতা ব্যাখা করুন।

নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর

০১. জলবায়ু কূটনীতি কী? জলবায়ু কূটনীতি কোন কোন মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে কাজ করে? ৪

নমুনা উত্তর: ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে নিয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রক্রিয়া হলো জলবায়ু কূটনীতি। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে জলবায়ু কূটনীতি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশসমূহ, যারা জলবায়ু দূষণ ও পরিবর্তনে অধিকতর ভূমিকা রাখছে, তাদের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে সাহায্য করাই বর্তমানে জলবায়ু কূটনীতির প্রধান লক্ষ্য। জলবায়ু কূটনীতির ফলাফল হচ্ছে Paris Act, V-20, Loss And Damage Fund ইত্যাদি।

বর্তমানে প্রতিটি দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে জলবায়ুকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। আর এ জলবায়ুকে রক্ষা করার জন্য জলবায়ু কূটনীতি কার্যকর করার চেষ্টা করছে। জলবায়ু কূটনীতি মূলত কিছু মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে কাজ করে। যেমন-

- জলবায়ু পরিবর্তনে শিল্পোন্নত দেশগুলোর ভূমিকা কতটুকু?
- জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রগুলো কীভাবে তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে?
- ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলো কীভাবে তাদের দায় শোধ করবে?
- বিশ্বকে কীভাবে টেকসই ও সবুজ জ্বালানিতে রূপান্তর করা যায়?
- Climate Finance নামের ব্যয়ের খাত কীভাবে নির্ধারিত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন রোধ ও জলবায়ু কূটনীতি বাস্তবায়নের জন্য যে সংগঠনগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে- IPCC, UNEP, UNFCCC ইত্যাদি।

০২. 'কার্বন ট্রেডিং-মুক্তি নয়, বরং ফাঁদ'-ব্যাখ্যা করুন। ২ × ২ = ৪

নমুনা উত্তর: কিয়োটো প্রটোকলের মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা হয়। তবে নিজেদের শিল্পোন্নয়ন অব্যাহত রাখার স্বার্থে ধনী দেশগুলো 'কার্বন ট্রেডিং' নামে একটি নতুন ব্যবস্থার প্রচলন করে, যাতে একদিকে শিল্পের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত না হয় এবং অন্যদিকে গ্যাস নিঃসরণ কাগজে-কলমে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এই ব্যবস্থায় কার্বন নিঃসরণের একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত থাকে। যে দেশ এই সীমার চেয়ে কম কার্বন নিঃসরণ করে, তারা সেই পরিমাণ অনুযায়ী কার্বন ক্রেডিট অর্জন করে। বিপরীতে, যারা নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণ করে, তারা সেই অতিরিক্ত নিঃসরণ বৈধ করার জন্য অন্য দেশের কাছ থেকে কার্বন ক্রেডিট কিনে নেয়। এর ফলে উন্নত দেশগুলো অর্থের বিনিময়ে তাদের অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের বৈধতা পেয়ে যাচ্ছে। বাস্তবে এতে কার্বন নিঃসরণ কমছে না; বরং কার্বন ক্রেডিট কিনে উন্নত দেশগুলো দায় এড়িয়ে নির্বিঘ্নে কার্বন নিঃসরণ অব্যাহত রাখছে।

কিয়োটো প্রটোকলে নির্ধারিত কার্বন নিঃসরণের সীমার তুলনায় বাংলাদেশ অনেক কম কার্বন নিঃসরণ করে। বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো কার্বন বাণিজ্যের মাধ্যমে আপাতদৃষ্টিতে কিছু আর্থিক সুবিধা পেলেও, ভবিষ্যতে এসব দেশই জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক ঝুঁকিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই বলা যায়, কার্বন ট্রেডিং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যকর কোনো সমাধান নয়; বরং এটি উন্নত দেশগুলোর স্বার্থরক্ষায় গড়ে ওঠা একটি পরিকল্পিত কৌশল।

০৩. জীববৈচিত্র্য কনভেনশন (CBD) সম্পর্কে লিখুন। ৪

নমুনা উত্তর: জীববৈচিত্র্য কনভেনশন (CBD) হলো ১৯৯২ সালের রিও আর্থ সামিটে গৃহীত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি, যার মূল লক্ষ্য হলো প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা এবং মানুষের সাথে পরিবেশের টেকসই সহাবস্থান নিশ্চিত করা। নিচে এর মূল বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

জীববৈচিত্র্য কনভেনশনের লক্ষ্যসমূহ

- **সংরক্ষণ:** পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবের বৈচিত্র্য রক্ষা করা।
- **টেকসই ব্যবহার:** প্রাকৃতিক সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ফুরিয়ে না যায়।
- **ন্যায্য বণ্টন:** জৈব সম্পদ (যেমন: ঔষধি গাছ) ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত সুফল বা মুনাফা সম্পদশালী দেশ ও মূল উৎসের দেশের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা।

গুরুত্বপূর্ণ প্রটোকলসমূহ

- **কার্টাগেনা প্রটোকল (২০০০):** এটি মূলত ল্যাবে তৈরি রূপান্তরিত জীব বা GMO-এর নিরাপদ ব্যবহার ও স্থানান্তর নিশ্চিত করে।
- **নাগোয়া প্রটোকল (২০১০):** এটি জৈব সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহারের লভ্যাংশ ন্যায্যভাবে বণ্টনের ওপর জোর দেয়।

নতুন লক্ষ্যমাত্রা

২০২২ সালের কুনমিং-মন্ট্রিল কাঠামো অনুযায়ী একটি ঐতিহাসিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর অধীনে ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর অন্তত ৩০ শতাংশ ভূমি এবং ৩০ শতাংশ জলভাগকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য কনভেনশন দেশগুলোকে আইনিভাবে বাধ্য করে যেন তারা তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি যুক্ত করে। এটি বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর তাদের নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। প্রজাতি বিলুপ্তির বর্তমান হার রুখতে এবং বাস্তুসংস্থানকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে CBD-এর নীতিমালা বাস্তবায়ন করা এখন বিশ্ববাসীর জন্য অপরিহার্য।

০৪. প্যারিস জলবায়ু চুক্তি কী? Green Climate Fund সম্পর্কে লিখুন। ৪

নমুনা উত্তর: প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত কপ-২১ সম্মেলনে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তি। এই চুক্তিতে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনা এবং নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনার বিষয়ে দেশগুলো নিজেরা আইন তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তবে এ প্রতিশ্রুতি পূরণে দেশগুলোর কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা প্যারিস চুক্তিতে রাখা হয়নি। ঐতিহাসিক এ চুক্তি অনুযায়ী-

- শিল্প নির্গমন মাত্রা কমিয়ে আনা হবে।
- যুক্তরাষ্ট্র তার গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন ২০২৫ সালের মধ্যে ২৬-২৮ শতাংশ কমিয়ে আনবে।
- কয়লার বদলে বিকল্প উৎসে জোর দেওয়া হবে।
- উন্নত দেশগুলো দূষণের জন্য দায়ী সেহেতু আমেরিকার মতো উন্নত দেশগুলো গরিব দেশগুলোকে বছরে ১০ হাজার কোটি ডলার সাহায্য দেবে।
- ভবিষ্যতে এই ক্ষতিপূরণ বাড়বে।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে ১৯৭টি দেশের মধ্যে স্বাক্ষর করে ১৯৫টি দেশ। শুধু সিরিয়া ও নিকারাগুয়া চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেনি।

Green Climate Fund (GCF)

GCF হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য UNFCCC এর অধীন একটি আন্তর্জাতিক তহবিল। COP-15 (কোপেনহেগেন চুক্তি) অনুযায়ী ২০১০ সালে GCF প্রবর্তন করা হয় এবং ২০১৫ সালে কার্যক্রম শুরু করে। GCF এর সদর দপ্তর: ইনচন, দক্ষিণ কোরিয়া।

লক্ষ্যসমূহ

১. উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করতে সহায়তা করা।
২. গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করতে টেকসই প্রকল্প বাস্তবায়ন।
৩. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও অবকাঠামো গড়ে তোলা।

আর্থিক কাঠামো

- প্রাথমিক লক্ষ্য: বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার।
- পোর্টফোলিও এর আকার: ১৯.৩ বিলিয়ন ডলার (ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত)।
- বরাদ্দ পদ্ধতি: দেশগুলো অর্থায়নের জন্য সরাসরি আবেদন করতে পারে।